কামিনী কাঞ্চন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশক ❑
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
১ কে, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২

❑ প্রকাশকাল ❑
৫ ডিসেম্বর, ১৯৬২

❑ প্রচ্ছদ ❑
শেখর মণ্ডল, কলকাতা-৬

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রণ ❑
পূর্ণিমা প্রিন্টার্স
টি/২এ/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা-৬৭

এই লেখকের অন্যান্য বই

অগ্নিসংকেত
অচেনা আকাশ
একে একে
কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই
ক্যানসার
ঝাড়ফুঁক
তুমি আর আমি
তৃতীয় ব্যক্তি
দুটি দবজা
দুটি চেয়াব
পায়রা
পেয়ালা পিরিচ (গল্প)
ফিরে ফিরে আসি
বসবাস
মুখোশের চোখে জল
রসেবশে
রাখিস মা রসেবশে
লোটাকম্বল ১ম পর্ব
লোটাকম্বল ২য় পর্ব
শঙ্খচিল
শাখা প্রশাখা
শ্বেতপাথরের টেবিল (গল্প)
সোফা কাম বেড (গল্প)
হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ

আমার নাম তারক সরকার। সবাই আমাকে বলে গুছাইত। কেন বলে তা আমি জানি। আমি গোছানোর মাস্টার। যেখানেই যাই, সেখান থেকে বেশ গোছগাছ করে আনি। নিজের ফিউচার ছাড়া কিছুই বুঝি না, বুঝতেও চাই না। যেখানেই ধান্দা, সেখানেই এই বান্দা। এই যে আমাকে গুছাইত বলে, আমার কোনও লজ্জা নেই। আদর্শ! গুলি মারো। চরিত্র ফেঁড়ে ফেলো। সম্পর্ক: মারো কিক্। নিজের স্বার্থ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই নেই। গোছগাছ করো ভাই, চুটিয়ে বাঁচো ভাই।

মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয়, আমি কোনও মহাপুরুষ নই তো! অবতার-টবতার। আমার শৈশবের যে-সব লীলা, মানে বাল্যলীলার কথা লোকমুখে শুনতে পাই, সে তো সাঙ্ঘাতিক কথা। লো-ভল্টেজের শ্রীকৃষ্ণের মতো। পুতনা বধ, অঘাসুর বধ, দামবন্ধন, গিরি গোবর্ধন ধারণের মতো না হলেও, প্রায় কাছাকাছি যায়। আমার বাবা মাকে সব সময় অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম। স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ হবার সুযোগ দিইনি। সেটা শুরু হয়েছিল আমার হামার কাল থেকে।

আমার বাবার কিছু বিটকেল নেশা ছিল। তার মধ্যে একটা হল মাছ ধরা। সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। সারা সপ্তাহ দশটা পাঁচটা। রবিবারটা ছিল তাঁর মাতনের দিন। মার কাটারি করার বার। বাড়ির কাছেই একটা ডোবা ছিল। বাবা বলতেন সরোবর। ১৯০৫ সালে দয়ারাম ঘোষের আমলে ওটা ছিল পদ্মদীঘি। ইতিহাস বলছে। অতএব এখন ডোবা হলেও ওর চরিত্রটা সরোবরের। সেই সময় ওতে কালবোস মাছ ঘাই মারত। গভীর রাতে একটা

গাইয়ে মাছ্ সাঁ সাঁ করে বাঁশি বাজাত। পূর্ণিমার গভীর রাতে মাঝপুকুরে অনেকের কমলে কামিনী দর্শন হয়েছে। দর্শনের পর তাদের ভাগ্য ফিরে গেছে। অপুত্রের পুত্র হয়েছে। নির্ধনের ধন।

বাবা সেই ডোবায় মাছ্ ধরতে বসতেন। মন্দ লোকে বলত বিশ্বনাথ সরকার মাছ্ ধরার নাম করে অন্য জিনিস ধরত। ধরত চোখ দিয়ে। ডোবার ওপারে একদল খারাপ মেয়েমানুষ থাকত। তাদের সাজপোশাক খোলামেলা। কেউ কেউ সিগারেট টানত। ধেনো খেয়ে টালমাটাল নৃত্য করত। নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি, খেস্তাখিস্তি করত, আর বিশ্বনাথ হাঁ করে দেখত। সরকারদের নাকি ওইটাই ছিল ট্র্যাডিশান। দু পুরুষ আগে বাঘা সরকার নিজের জমিতে ওদের বসিয়েছিলেন। পা বাড়ালেই পান ভোজন, খেমটা নাচের আসর। রঙ্গরস। লোকে তো কত কী বলে! কান দিলে চলে।

এ হল সাইড টক। আসল কথায় আসি। আমার হামার কথা। হামালীলা। টোপগাঁথা বঁড়শি পড়ে আছে। মাছ্ ধরতে যাবেন তিনি। শিশু তারক গলগলে হামা দিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে টোপশুদ্ধ বঁড়শিটা গিলে ফেলল। ছোটদের স্বভাব হল, সব জিনিস চেখে দেখা চাই। আচ্ছা, দেখলি, টোপসুদ্ধ মালটা গিলে ফেললেই পারতিস। তা তো হবে না। তারক সরকারের সব কাজই বেশ গুছিয়ে।। এইবার সে সুতো ধরে মারল টান। বড়শিটা আটকে গেল টাগরায়। এইবার শুরু হল তার হামা দিয়ে গৃহ প্রদক্ষিণ। চার হাত পায়ে তারক চলেছে, পেছন পেছন চলেছে সুতোয় বাঁধা সরু ছিপ। খড়খড় করে আসছে। ঝ্যাঁটা, জুতো, পাপোশ সব নিয়ে আসছে টানতে টানতে। তারকের পেছন পেছন যেন মিছিল চলেছে। অবশেষে দরজার খাঁজে চলমান ছিপ আটকে গেল। ছিপে মাছ ধরে। এ যেন মাছে ছিপ ধরেছে। সুতোর টানে বঁড়শি বেশ গদগদে হয়ে গলায় গেঁথে গেল। তখন তারক তার বিখ্যাত গলায় কেঁদে উঠল।

তারক তারস্বরে অষ্টপ্রহর চেল্লাবে, এ আর নতুন কথা কী। এ কালের প্রেসার কুকার যেমন তিনবার সিটি না মারলে মেয়েরা ছুটে আসে না, সেইরকম তারকের কমপ্রেসড কান্নায় যতক্ষণ না বাইরের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই উদাসীন। তারকের মা একটু ল্যাদাড়ুস মতো ছিলেন। নির্ভেজাল ভাল মানুষ। কাছা-কোঁচার ঠিক থাকত না। এই আঁচল খুলে পড়ছে। সায়া নেমে যাচ্ছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে ঘটি ওল্টাচ্ছে। বাটি ঠিকরোচ্ছে। তেলের জায়গা কাত মারছে। সারাদিনে তিন

চারবার জানালায় মাথা ঠুকে যাচ্ছে। বঁটিতে আঙুলের মাথা কেটে যাচ্ছে। ভুলে গরম চাটু খালি হাতে ধরতে গিয়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে। ফ্যানে পা পড়ে কাটা কলাগাছের মতো উল্টে পড়ে যাচ্ছে। সারাদিনই এক উত্তমখুস্তম ব্যাপার তারকের মায়ের। সেই আত্মভোলা মায়ের ছেলে তারক। শোনা যায়, তেরো বছর বয়সে তারকের মা চম্পার ভর হত। শনিবার, মঙ্গলার মা মঙ্গলচণ্ডী ঘাড়ে এসে চাপতেন। পাড়ার লোক একেবারে ভেঙে পড়ত। মা-মাগো। ক্যাঁত করে আমার স্বামীটার মুখে বাঁ পায়ের একটা লাথি মার মা, জন্মের মতো ধেনো খাওয়া ঘুচে যাক। মা, আমার ছেলেটার রেলে চাকরি লেগে যাবে মা। শত শত বায়না। চম্পা হেলছে, দুলছে। ফুল ছুঁড়ছে। চোখ জবা ফুল। গায়ে ফুল পড়লেই অভীষ্ট লাভ। পটলার মা বড় জ্বালাচ্ছে জননী। কাছে গেলেই ঘেয়ো কুত্তার মতো কামড়াতে আসে। বশীকরণের একটা জবা দে মা। বিলেত ফেরত ডাক্তার বললেন, পিউবারটি। মেয়ে আপনাদের সঙ্গীর অভাবে অমন করছে। আপাতত কিছুদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখুন। ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি। আর নো ডিম। ডিম ছুঁতে দেবেন না।

সবাই বলে, ওই উঠতি বয়সে, গাদাগাদা ঘুমের বড়িই চম্পাকে অমন হুঁশো করেছে। এক করতে আর এক করে। উত্তর-পশ্চিম জ্ঞান নেই। সেই চম্পা এসে দেখলে, ছেলের মুখে মাছধরা সুতো। দরজার ফাঁকে আটকে আছে ছিপ। ছেলে পরিত্রাহী চেল্লাচ্ছে। সুতোর মাথাটা চলে গেছে গলার ভেতরে।

—এ কী রে। কী সর্বনাশ।

মা যত চেল্লায়, ছেলেও তত চেল্লায়। হই হই, দক্ষযজ্ঞ। তারকের বাবা তখন টিনের চালায় লাউগাছ তোলার কাজে ব্যস্ত। তিনি ভাবলেন, তাঁর করিতকর্মা বউ তেলের শিশির মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বসে আছে। সম্প্রতি এই কাণ্ডটি চম্পার জীবনে ঘটে গেছে। আঙুল ঢুকেছে বেরোচ্ছে না। তারকের বাবা বলছেন, তবলাবাঁধা হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকে ভেঙে বের করে আনো। তারপর, সেই সেইরকম, টিংচার আইডিন লাগিয়ে দাও।

শেষে হড়কে নেমে এসে দেখলেন, মামলা অন্যরকম। একেবারে ক্যাডাভ্যারাস কেস। খুব চিন্তার বিষয়। এদিকে, গ্রামে গ্রামে বার্তা রটি গেল ক্রমে। তারকের বাবা মাছের বদলে ছিপে ছেলে ধরেছে। ডোবার ওপারের ডবকা মেয়েরা ছুটে এসেছে। তাদেরই মধ্যে একজন বুদ্ধি করে কাঁচি দিয়ে আগে সুতোটা কেটে দিলে। ছিপ থেকে ছেলে আলাদা হল। সামান্য

একটুকরো সুতো মুখের বাইরে লকলক করতে লাগল সাপের জিভের মতো। এইবার আসল সমস্যার কী হবে! বঁড়শি তো গলায়।

তারকের বাবা কিছুক্ষণ, কী হবে, কী হবে, কী করা যায়, বলে দাপাদাপি করে সিদ্ধান্তে এলেন—জলে মাছ অনেক সময় গলার বঁড়শি খুলে পালায়। তা একে জলে ফেলে দেখলে কেমন হয়!

যে মেয়েটি এতক্ষণ কসরত করছিল, সে বললে, আহা বাপের কী বুদ্ধি! যেন বৈকুণ্ঠের ষাঁড়। দুটো চামচে আনো। উঠনময় ভৈরবের মতো দাপিয়ে না বেড়িয়ে।

চামচে এল। সেই মহিলা তার ডুরে শাড়ি পরা কোলে তারককে ফেলে হাঁ করাল। একটা চামচে দিয়ে ঠেলে রেখে, আর একটা চামচের হাতল দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় টাগরা থেকে সেই বঁড়শিটা তুলে নিয়ে এল। ছেলের চিল চিৎকার। মায়ের কোলে ছেলেকে তুলে দিয়ে, মহিলা হেঁকে বললে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে মাইটা মুখে গুঁজে দাও না। সব ফ্যাশানের মা হয়েছে!

কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে তারকের বাবাকে বললে, ছেলে তো এখুনি কেলিয়ে যেত। তোমার ওই ডোবার মাছ ধরা আর কতদিন চলবে!

তারকের বাবা কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললেন—আমার সাক্ষাৎ জগদম্বা।

মহিলা বললেন—মরণ আমার।

তারকের ফ্যামিলি সার্কলে এই কাহিনীটি প্রায়ই ঘুরে ঘুরে আসে। যারা সাহস করে আর এক ধাপ এগোতে পারে, তারা বলে, তোর বাবা একটা মাছ ধরেছিল বটে! সেই জগদম্বার সঙ্গে সেই রাত থেকেই হলায়গলায়। হরির দোকানের কাটলেট, ভজুয়ার দোকানের মালাই। কেবল বাজি পোড়ানোটা বাকি ছিল। গোলাপী সিল্কের শাড়ি, শার্টিনের কাঁচুলি। ঝুমুক ঝুমুক ঝুমুর বাজে, পাছা দুলিয়ে ডালিম নাচে।

—এ তোমার কী অধঃপতন বিশ্বনাথ।

—ওই তো তারকের আসল মা। ভিক্ষে মা। জীবন ভিক্ষে দিয়েছে।

চম্পা সরকার ফ্যালফ্যাল করে দেখে। আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায়, আমারই আঙিনা দিয়া। মায়ের শুভানুধ্যায়ীরা যখন বলতেন, একটা দক্ষযজ্ঞ লাগাতে পারছ না। মেয়ে হয়ে জন্মে করলেটা কী! তোমার না, আইবুড়ো বেলায় মঙ্গলচণ্ডীর ভর হত! এক ছেলেতেই আশ মিটে গেল!

মা বলত, ভৈরব, ভৈরবী নিয়ে সাধন ভজন করছে করুক না। যার যাতে সুখ।

প্রতিবেশিনীরা বিরক্ত হয়ে চলে যেত। যে নিজের ভাল চায় না, তার সর্বনাশ কে আটকাবে!

বিশ্বনাথ সরকার রেল কোম্পানির গুদোমের বড়বাবু। হেড গুডস ক্লার্ক। কাঁচা পয়সা। এদিকে উড়ছে, ওদিকে উড়ছে। সবাই বললে, তারক বেটা অবতার। বঁড়শি গেলাটা ছিল ওর ছল। আসলে ওটা ওর কৃপা। এক পতিতাকে কৃপা করতে চেয়েছিল। ও হল মঙ্গলচণ্ডীর ছেলে। ওর গলার বঁড়শি খুলে একজনের কপাল খুলে গেল। বিশ্বনাথ সরকার তাকে আলাদা বাড়িতে রেখে পুষছে। মদ ধরেছে। ভুঁড়ি নেমেছে। আবার কেউ কেউ বললে—ছেলেটার জন্যে বাপটা বখে গেল। ডোবার এ-পারে বসে দেখত, ওপারে যাওয়ার সাহস ছিল না। সে বরং ছিল ভাল, এখন তো বাড়িতেই থাকে না।

তারক এইবার তার দুনম্বর লীলা দেখাল। বেশ চড়কো হয়েছে। পাকাপাকা বুলি শিখেছে। হুটোপাটির প্রতিভা বেড়েছে। কড়াধাতের মানুষ বলছে, ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে গেল। একটা এঁচোড়ে পাকা, অসভ্য ধরনের জীব তৈরি হচ্ছে। ধ্যাস্‌কা মা, চৌঘুড়ি বাপ। দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। ইট ছুঁড়ছে, জল ছিটোচ্ছে, কেড়েবিগড়ে খাচ্ছে, লাথি মেরে সব উল্টে দিচ্ছে। কারও বাড়িতে গেলে সবাই তটস্থ। দেখ-তো না-দেখ সব লণ্ডভণ্ড। সেদিন চাটুজ্যের অলওয়েভ রেডিওটার দফারফা করে এসেছে। মানুষরূপী জানোয়ার।

এ-কথাটা অবশ্য বিনা প্রতিবাদে মেনে নেওয়া সহজ নয়। কেউ কেউ বললে, দাঁড়াও আমরা একটু শাস্ত্র-পুরাণ ঘেঁটে দেখি। না, আমরা মানতে পারছি না। মহাপ্রভুও শৈশবে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। আচ্ছা, বউমা এই পুত্রটি তোমার গর্ভে আসার আগে তোমার কোনও স্বপ্নদর্শন হয়েছিল?

—একটা গণ্ডার তেড়ে আসছিল।

—গণ্ডার? ষাঁড় নয়। ষাঁড় মহাদেবের বাহন। গণ্ডার কোন দেবতার বাহন?

ডিকশেনারি দেখতে হচ্ছে। ডিকশেনারি নয়, দেখতে হবে অমরকোষ। না, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।

মাথা নেড়ে সুপণ্ডিত বললেন, পাশ্চাত্য প্রাচ্যের এই সমস্যায় আলোকপাত করতে পারবে না। সমাধান আমার কাছে। গণ্ডার আর কচ্ছপে বিশেষ তফাত নেই। কচ্ছপ উঠে দাঁড়াতে পারলেই গণ্ডার। কচ্ছপের পিঠ আর গণ্ডারের

পিঠ প্রায় একই রকম। চালের মতো। গণ্ডারকে থেবড়ে বসাতে পারলেই কচ্ছপ। কচ্ছপ মানে কূর্ম। কূর্ম অবতার। কূর্মাবতার। সরকার বংশে সেই কূর্মাবতার আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি সৃষ্টিকে রক্ষা করবেন।

—বলো কী ভায়া! এ তো সাক্ষাৎ প্রলয়! যেখানে যাচ্ছে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে আসছে।

তাই তো হবে। প্রলয়ের পর সৃষ্টি। সৃষ্টির পর প্রলয়। পড়নি, প্রলয়পয়োধি জলে, কূর্মাবতার খেলা করে।

মহামানব তার দ্বিতীয় লীলাখেলাটি দেখাল ঘোষালদের বাড়িতে। বড়লোক। সাজানো গোছানো ঘরদোর। বিশাল শোওয়ার ঘর। জামদানী খাট। ঝালর ঝোলর চাদর। টেবিলে কাজকরা টেবিলক্লথ। দেয়ালে বড় বড় ছবি। তারক সরকার তখন নানারকম হাতের কাজ শিখেছে, তার মধ্যে একটা হল দেশলাই জ্বালানো। ঘরে কেউ কোথাও নেই। টেবিলের ওপর একটা ভর্তি দেশলাই। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ডিঙি মেরে দেশলাইটা নিলুম। একটা কাঠি বের করে খস্ করে ঘষামাত্রই দপ্ করে জ্বলে গেল। এইবার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। আগুনের দাহিকা শক্তি পরীক্ষা করার বাসনা। চাদরের ঝোলা অংশে জ্বলন্ত কাঠিটা ধরলুম। ধুস্ করে ধরে গেল। এইবার শিশু তারক নাচতে নাচতে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। নীচে মহিলামহল। খুব গল্পগাছা হচ্ছে। খিলখিল হাসি। পানের খিলি ঘুরছে হাতে হাতে। তাস খেলবে বড়লোকের বউরা। তাস ভাঁজাই হচ্ছে। শিশু তারক তখন ঝকঝকে রঙ করা দেয়ালে নখের আঁচড়ে নক্শা কাটার চেষ্টা করছে। হঠাৎ বাইরের রাস্তা থেকে চিৎকার—আগুন, আগুন। দোতলার ঘরে আগুন।

শিশু তারককে নিয়ে যে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, সে বললে, পালা, পালা। উল্টো দিকের মাঠে দাঁড়িয়ে কূর্মাবতার প্রলয়ের দৃশ্য দেখছে। দোতলার খোলা জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লকলকে জিভ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল এসে গেল ঘণ্টা বাজিয়ে। কূর্মাবতারের কী আনন্দ! ধেই ধেই নাচ। আজ আমাদের নেড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল। দোতলাটা বেশ লাগদাঁই ভাবে পুড়ে গেল। নীচেরতলা জল থইথই। পাড়ার সবাই বলতে লাগল—অনেকদিন পরে একটা হল বটে। জবরদস্ত একটা কাণ্ড। সেই দশ বছর আগে একবার যাত্রার প্যাণ্ডেলে আগুন লেগেছিল। এরই মধ্যে ঘোষাল বাড়িতে কিছু লুটপাটও হয়ে গেল। দেয়াল ঘড়ি, দামি মূর্তি। সাহায্য করার নাম করে সব ঢুকল, বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে যা পারলে

নিয়ে গেল হাতিয়ে।

কিছুদিন শিশু তারক লীলা সম্বরণ করে রইল। তারপর ছোট একটা কেরামতি দেখাল। খেলা করতে এসেছিল পাড়ার একটা মেয়ে। টিনের কৌটো, রান্নাবাড়ার জিনিস, পুতুল, আয়নার টুকরো। উঠনে বসে খেলা হচ্ছে। শিশু তারক কিছুটা চুন গুলে এনে বললে, এই নে খা, মিছিমিছি দুধ। মেয়েটা ঢক করে খেয়েই লাফাতে শুরু করল। ছুটে এল তার বাড়ির লোকজন। ধুন্ধুমার কাণ্ড। মারকাট ব্যাপার। প্রতিবেশীরা চম্পা সরকারের পিণ্ডি চটকে দিলে। ছেলের বাপের তুলো ধোনা হল। দুশ্চরিত্র, ঘুসখোর, চোর। ছেলে নয় তো সিন্ধুঘোটক। এমন ছেলেকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা উচিত। মেয়েটাকে কাপে করে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়ানো হল। সবাই চলে যাওয়ার পর চম্পা সরকার হাউ হাউ করে কান্না জুড়ল। ভগবান এখনও কেন নিচ্ছে না আমাকে। এত লোক যায় আমি কেন যাই না। তখন কূর্মবিতার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—কাঁদিসনি মা, কাঁদিসনি। একটু ছানা খেয়ে নে।

মায়ের জন্যে একটা ভয়ঙ্কর দুঃখ সেই বয়েস থেকেই আমার মনে দানা বেঁধেছিল। মার চোখে জল দেখলে আমার মাথায় খুন চেপে যেত। আর সেইজন্যে আমি আমার বাবাকে একদম সহ্য করতে পারতুম না। একটা ভুঁড়িঅলা লোক। পাড়ার সবাই বাবার নিন্দে করত। মেয়েরা সামনে আসতে ভয় পেত। বলত, লোকটার চোখের নজর ভাল নয়। লোকটা নিজের বউকে দেখে না। একটা খারাপ মেয়ের সঙ্গে থাকে। আমার সামনেই বলত। আর আমার চোখে জল এসে যেত। সকলের বাবা কত ভাল। আমার বাবা কেন অমন। ছোট ছোট ইট নিয়ে আমি একটা জায়গায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, আর বাবাকে আসতে দেখলেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতুম। একটা দুটো লেগেও যেত। আমার মনে হত, লোকটা একটা দৈত্য। আমাকে ধরার জন্যে তেড়ে আসত। পারবে কেন, আমি পনপন করে ছুটে পালাতুম। আমার ওপর খুব যে একটা ভালবাসা ছিল তাও নয়। দু'চারবার ডাকত। তারপর বলত, ধুস্ শালা! আসলে লোকটা নিজেকে ছাড়া কারোকে ভালবাসত না। গপগপ করে খাবো, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবো, আর বড় বড় কথা বলব। আমার বাবা যতটা খারাপ ছিল, আমার মা ঠিক ততটাই ভাল ছিল।

শিশু তারক হল কিশোর তারক। তখন জানতে পারল, তার বাবার আর একটা ছেলে হয়েছে। একটা ভয় এল, কবে আমাদের বাড়ি থেকে দূর করে

দেয়। মা বলত, খোকা, এইবার আমাদের পথে বসাবে। লোকের বাড়ি ঝিগিরি করে আমাদের খেতে হবে। এই ছিল বরাতে ! তুই তাড়াতাড়ি মানুষ হয়ে যা তো !

সেই সময় থেকেই আমার সরকার টাইটেলটা গুছাইতের দিকে বদলাতে শুরু করল। সকালবেলা বেরিয়ে পড়তুম বনেবাদাড়ে। মাকে সাহায্য করতে হবে। কলমিশাক, গিমেশাক, ডুমুর, কালো কচু, যেখানে যা পাওয়া যায়, সব ঘাড়ে করে নিয়ে আসতুম। একদিন দেখি বড়লোকের বাগানের বাইরে কলাগাছ কেটে ফেলে দিয়েছে। ভীমের গদার মতো কাঁধে করে নিয়ে এলুম। থোড় হবে। মায়ের মুখে হাসি ফুটত। আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল, আমাদের মতোই দুর্ভাগা। মা, সেই শাকপাতা দু'ভাগ করে বলত—যা একটা ভাগ সরলাকে দিয়ে আয়। সরলাকে আমি মাসী বলতুম। স্বামী হঠাৎ মারা গেছেন। কেউ কোথাও নেই। আমার হাত থেকে ওইসব নিতে নিতে সরলামাসীর চোখে জল আসত, বলতেন, তোর মা কী রে ! দেবী। দেবী না হলে কেউ অন্যের জন্যে এত ভাবে !

সেই বয়েস থেকেই আমার মনে একটা ভরসা এসে গিয়েছিল, হাল ছেড়ে না দিলে পৃথিবীতে যেভাবেই হোক দিন চালানো যায়। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকলে হবে না খাটতে হবে, ধান্দা বুঝতে হবে, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে। গুছাইত হতে হবে। সেই বয়সেই এই শিক্ষাটা আমার হয়ে গিয়েছিল। শরীর ঠিক রাখার ওষুধও শিখে গিয়েছিলুম, আমাদের গ্রামের প্রাচীন কালীবাড়ির পুরোহিতের কাছে। তুলসীপাতা, শিউলিপাতা, কালমেঘ আর তেলাকুচো। সেই পূজারী আমাকে ভীষণ ভালবাসতেন। ছ'ফুট দীর্ঘ শরীর। টকটকে ফর্সা রঙ। খাড়া নাক। ভরাট, গমগমে গলা। তাঁর নাম ছিল চন্দ্রবাবু। মন্দিরে পুজোর আসনে বসে যখন মন্ত্র পড়তেন তখন সব কেঁপে উঠত। গমগম করত চারপাশ। আমি বলতুম, চন্দ্রদাদু। চন্দ্রদাদুর কাছেই আমার সময় কাটত। একটু আধটু ফাই ফরমাশ খাটতুম। ফুল তুলে আন, বেলপাতা পাড়, পুজোর বাসনগুলো একটু ধুয়ে দে। চিঠিটা ফেলে দিয়ে আয় পোস্টবক্সে। ছোটখাট সব কাজ। ভীষণ ভালবাসতেন বলে ভালও লাগত তাঁর কাজ করতে। অনেক সময় বলতেন, শিব, আজ আমার সঙ্গে প্রসাদ খেয়ে যা। আমার নাম রেখেছিলেন, শিব। আমি বলতুম, চন্দ্রদাদু, একা তো খেতে পারব না, আমার মা। আমার চোখে তখন জল। চন্দ্রদাদু বলতেন, জীবনে তোর কোনও ভয় নেই রে শিব। তুই যে মাতৃভক্ত। ঠিক মতো ধরে

থাক। তোর মায়ের জন্যে প্রসাদ বেঁধে দোবো। আয়, হাত লাগা।

চন্দ্রদাদুর কেউ ছিল না। নিজেই উনুন ধরিয়ে, সব যোগাড়যন্ত্র করে ভোগ রাঁধতে বসতেন। আমাকে যেদিন বলতেন, সেদিন আমি সাহায্য করতুম। ভাঙ কয়লা, নিয়ে আয় গঙ্গাজল। চাল বাছ। মা কালী কল্মিশাক খেতে ভালবাসেন। মনে হত পিকনিক হচ্ছে। বিশাল একটা ঘেরা জায়গায় মন্দির, নাটমন্দির, বাগান, গেস্ট হাউস, কোয়ার্টার। কী ভাল লাগত। মনে হত আর বাড়ি ফিরব না। কালীবাড়িতে অনেক শাড়ি পড়ত। চন্দ্রদাদু মাকে সেই শাড়ির একটা দুটো দিতেন। সবাই বলত, ছেলেটা এই বয়স থেকে ভিক্ষে শিখে গেল। আমার তখন হাসি পেত। কেউ ঘুসখোর, কেউ ছিঁচকে চোর, কেউ বড়লোকের উমেদার, তারা বলছে ছেলেটা ভিক্ষের লাইনে গেল। তোমরা আমার মাকে খেতে দেবে!

কালীবাড়িতে রবিবার রবিবার অনেক বড় বড় লোক আসতেন। চন্দ্রদাদু খুব ভাল কোষ্ঠী-বিচার করতে পারতেন। নাটমন্দিরে কালীকীর্তন হত। আসত রবিবাবু। খুব নামকরা মানুষ। সবাই বলতেন স্কলার। জীবনে কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি। বেশ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ ভাব। কালীবাড়িতে অনেক সুন্দরী বেড়াল ছিল। তাদের বাচ্চারা ছোটাছুটি করে বেড়াত। রবিবাবু তাদের একটা দুটোকে কোলে নিয়ে বেশ জমিয়ে বসে সকলের সঙ্গে দেশ বিদেশের গল্প করতেন। কেন জানি না, আমাকে বলতেন, বসে বসে শোনো। জীবনে বড় হতে হবে তো। আমি চুপ করে তাঁর পাশে বসে শুনতুম দেশ-বিদেশের কত গল্প, আর মনে মনে ভাবতুম, রবিবাবু যদি আমার বাবা হতেন। চন্দ্রদাদু একদিন রবিবাবুকে বললেন, এই চটপটে, বুদ্ধিমান, সুন্দর ছেলেটাকে আপনার স্কুলে ভর্তি করে নিন না। মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই। ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

—আমার স্কুল তো এ-পাড়ায় নয়।

—সে আর কী করা যাবে। একটু কষ্ট করবে। হাঁটবে। ছেলেটা খাটিয়ে আছে।

—সে আমি ফ্রি করে দিতে পারি, রোজ কিন্তু দু'মাইল হাঁটতে হবে

—আপনার কাছে থাকলে, ছেলেটা মানুষ হয়ে যাবে।

—ছেলেটাকে আমারও ভাল লেগে গেছে।

রবিবাবু হেডমাস্টার। তাঁর স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলুম। খুব কায়দার স্কুল। ঝকঝকে, তকতকে। অন্য ছেলেরা সব স্কুলের গাড়িতে আসে। আমি ট্যাং

ট্যাং করে হাঁটি। খারাপ লাগে না। কত কী দেখতে পাই। কোথাও নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কাঠের গোলায় কাঠ চেরাই হচ্ছে। ফার্নিচার তৈরি হচ্ছে। কাঠের কুচোর স্তূপ। মেয়েরা বস্তায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে। উনুন ধরাবে।

—একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে মালিককে জিজ্ঞেস করলুম, আমাকে দেবেন। আমার বগলে বইখাতা।

মালিক বললেন, তুমি কী করবে খোকা।

—আমার মা তো খুব গরিব। উনুন ধরাবে।

মোটাসোটা চেহারার মালিক। আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—কিসে নেবে? মনে হল, হাতে যেন স্বর্গ পেলুম। মায়ের কয়লা আর ঘুঁটের খরচ কত বেঁচে যাবে। আমি বললুম—তাহলে একটা বস্তা নিয়ে আসি।

—তুমি কোথায় থাকো খোকা?

তা দু মাইল দূরে।

—তুমি যাবে এতটা, আসবে এতটা, আবার মোট নিয়ে যাবে এতটা? দাঁড়াও আমি তোমাকে একটা বস্তা দিচ্ছি। কালকে ফেরত দিয়ে যেও।

আমি অনেকক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এত ভাল ব্যবহার করছেন কেন আমার সঙ্গে! বস্তায় কাঠের কুচো তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি আমার সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করলেন কেন?

মালিক বললেন, তোমাকে দেখে আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। জানো তো আমার ছেলেবেলাটাও তোমার মতোই ছিল। খুব গরিব ছিলুম আমরা। আমি একটা পাঠশালায় পড়তুম। আর সকাল বিকেল একটা গমকলে চাকরি করতুম। লোকের মোট বয়ে দিতুম। যা দু'চার পয়সা হত, মায়ের হাতে তুলে দিতুম। তাইতেই মা আমার সংসার চালাত। একটু বড় হয়ে রেলের কুলি হলুম। জানো তো, আমার বাড়ি ছিল বিহারে। তোমাকে দেখে আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল।

—তারপরে আপনি কী করে এত বড় হলেন?

—রামজী আমাকে দয়া করেছিলেন। আমি খুব ভাল কুস্তি করতে পারতুম। খুব ছোলা খেতুম আর ডন বৈঠক মারতুম। তারপর কুস্তির কম্পিটিশানে জিততে শুরু করলুম একের পর এক। মহাবীর প্রসাদ ছিলেন আমার গুরু। কোথাও টাকা দিত, কোথাও সোনার মেডেল। সেই সব

মেডেল বিক্রি করে আর জমানো টাকা এক করে চলে গেলুম আসামে। প্রথমে কাঠ চিনলুম, তারপর এই ব্যবসা। ছোট থেকে বড়। বড় হতে চাইলে বড় হওয়া যায়, তবে তোমাকে খাটতে হবে। আরাম করলে চলবে না।

বস্তার মধ্যে কাঠের কুঁচি, তার মধ্যে আমার বই। হাঁটছি। চড়চড়ে রোদ। মনে মনে গাইছি—কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। ভাবছি, মায়ের খুব আনন্দ হবে। দুটো পয়সা বাঁচা মানে, পুজোর জামাকাপড়।

মাথায় চটের বস্তা। কাঠের কুঁচোর তেমন ওজন থাকে না। হাতে একটা লাঠি। ছপটি মতো। কাঠের কুঁচোর মধ্যে থেকে পেয়ে গেছি। চলেছে, তারক গুছাইত। রেলকোম্পানির মালবাবুর ছেলে। তার একটা ভাই হয়েছে। বাবার ছেলে তো ভাইই হবে। মা সে যেই হোক। সেই ছেলেবেলায় যে বয়েসে আমার গলা থেকে বঁড়শি বের করেছিল, সেই সময়ের কথা আমার তেমন মনে নেই। তবে নানা লোকে যা বলে, আড়ালে দাঁড়িয়ে যা শুনেছি—চম্পা, তোমার সব আছে, কেবল একটারই অভাব, তুমি কোনওদিন ওদের মতো বেহায়া হতে পারবে না। অসভ্য হতে পারবে না। মদ খেয়ে মাতলামো করতে পারবে না।

যখন আমি নিজের মনে পথ হাঁটি, আমার মাথায় তখন সব নানারকম ভাবনা আসে। কাঠকলের বিহারীবাবু, আমার মাথায় চিন্তা ঢুকিয়েছেন—বড় হতে চাইলে হওয়া যায়। গরিবও বড় হতে পারে। হেরে গেলে হেরে যাবে। মনের জোর থাকলে জিত। কষ্টকে কষ্ট মনে করলে চলবে না। মনে করতে হবে, কষ্টের পরেই আসে সুখ।

বেলা পড়ে এলেও রোদের তেজ কমেনি। গলগল ঘাম। বাক্স আইসক্রিম যাচ্ছে। ঢগঢগ শব্দ করে। কখনও কখনও খেতে ইচ্ছে করে। হয়তো একটা দুটো পয়সাও থাকে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। একা একটা আইসক্রিম খাব। কিছুক্ষণের মধ্যে সঙ্গে আর একটা ছেলে জুটে গেল। তার পিঠে বস্তা। ছেঁড়া কাগজ কুড়োয়। সে আবার বিড়ি ফুঁকছে ফুকফুক করে। সে বললে—কাঠের চেয়ে কাগজ ভাল। তুই কাগজ কুড়োবি আর পিচবোর্ট কলে বেচে দিবি। কাঠের কুচিতে কোনও লাভ নেই। কাঠের গুঁড়ো হলে বরফ কল নিত।

ছেলেটা সমানে বকবক করলেও, চোখ পড়ে আছে রাস্তার দিকে। একটুকরো কাগজ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এও আর এক গুছাইত। দু'জনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ হাঁটার পর, ছেলেটা বললে, আয় একটু বসি। একটা

বিড়ি আছে—তোর হাফ, আমার হাফ।

আমি একটু দূরে বসলুম। ছেলেটার জামা-প্যান্ট নোংরা। লাল চুলে জট। গায়ে গন্ধ। বিড়ি ধরিয়ে বললে—সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করতে পারলে হেভি লাভ। বিড়িটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, নে টান।

—আমি বিড়ি খাই না।

ছেলেটা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—তুই তাহলে ভদ্দরলোক। লাইনে নতুন এসেছিস।

—আমরা গরিব ভদ্দরলোক।

—তাহলে তো শালা না খেয়ে মরবি। কোনওদিন লোহা, পেতলের লাইনে যেতে পারবি না।

—সেটা কী?

—পার্কের রেলিং, লোকের বাড়ির দরজার কড়া, কলের মুখ, নর্দমার ঢাকা, এসব গেঁড়াতে পারবি? মটোর গাড়ির লাইন আরও ভাল। পেট্রলের ক্যাপ, ওয়াইপার, হাবক্যাপ, সব খোলা যায়। হাতে হাতে দাম। জুতোর লাইন আছে। মন্দিরে মা মা করছে, জুতো নিয়ে চম্পট। গঙ্গার ঘাটে পেতলের ঘটি রেখে ডুব মারছে। চোখ রাখবি। যেই ডুব মারবে ঘটিটা তুল নিয়ে মার হাওয়া। একটা ঘটি হাপিস করতে পারলে একদিনের কামাই। তারপর বড় হয়ে যেই সাইকেলের প্যাডেলে পা পাবি, তখন সাইকেল চুরির লাইনে চলে যাবি। শালা ভদ্দরলোক! লেখা-পড়া ধরেছিস?

—হ্যাঁ। স্কুলে পড়ছি।

—তবে তো মরেছিস। পড়বি এক আর করবি এক। নে বিড়ির শেষ টানটা টান। তোর নাম কী?

—তারক।

—আমার নাম মদন। তোর মায়ের কোনও রোজগার আছে?

—না।

—আমার মা রাত্তিরে রোজগার করে। এদিকে আয়। একটা মাল দেখে যা।

মদন একটা ছোট্ট চার চৌকো কৌটা বের করল। পিচবোর্ডের। তার ওপর ল্যাংটো মেয়েছেলের ছবি। একেবারে অসভ্য একটা মেয়েছেলে। আমাদের ডোবার ওপারে এইরকম একটা অসভ্য আছে। জল থেকে উঠে এইভাবে চুল ঝাড়ে। যত ভাবি দেখব না, তাও দেখি। কী রকম ভাল

লাগে। সারা শরীর কেমন করে। ঠিক যেন সেই মেয়েটাই বাক্‌সটায় ছবি হয়ে গেছে।

ছেলেটা বললে—এ সব জ্যান্ত দেখেছিস ? শালা ভদ্দরলোক। রাত্তির বেলা ভদ্দরলোকরা আসে। আর এই যে দেখছিস জিনিসটা এইটা পরে ...

আর কোনও কথা নয় বস্তাটা মাথায় তুলে দে দৌড়। ছেলেটা একটা আধলা ইট তুলে ছুঁড়েছিল। পায়ের পাশ দিয়ে চলে গেল। গায়ে লাগলে হাসপাতাল। দৌড়তে দৌড়তে অনেকটা এসে, একটা বেড়ার ধারে বসে পড়লুম। হাঁপ ধরে গেছে। ভীষণ তেষ্টা। বেড়ার ওপাশে ফুলের বাগান। বড় বড় জবা বাতাসে দোল খাচ্ছে। মনে হল, ভেতরে গিয়ে একটু জল চাই। এমন সময় ফ্রক পরা ছোট্ট একটা মেয়ে বেরিয়ে এল।

খুকি এক গেলাস জল খাওয়াবে ?

—খুকি ! খুকি আবার কী ! আমার নাম জানো না। আমার নাম অঞ্জনা !

—অঞ্জনা ! কী সুন্দর নাম !

—আমার দাদি রেখেছে। তোমার নাম ?

—বিচ্ছিরি নাম, তারক।

—খুব খারাপ নয়। আমাদের বেড়া বাঁধে যে ঘরামি, তার নামও তারক। তুমি কী করো ?

—আমি স্কুলে পড়ি।

—বাবা, তাই বুঝি এক বস্তা বই তোমার। আবার কুঁচিকুঁচি বই। তুমি বুঝি দাঁত দিয়ে কেটে কেটে ইঁদুরের মতো পড়ো ?

মেয়েটাকে খুব আপন আপন মনে হচ্ছিল। যেন আমার অনেক কালের চেনা। বেড়া ধরে কথা বলছে। শরীর দোলাচ্ছে। একটা পা থেকে থেকে ওপর দিকে তুলে দিচ্ছে। একটু ছটফটে। শেষে বললে,

—অমন অসভ্যের মতো ঘেমেছ কেন ? তোমাদের স্কুলে পাখা নেই ?

—আমি যে এইটা মাথায় করে সেই কোথা থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। আবার সেই কত দূরে যাব।

—তুমি হতে চাইছ পথিক !

—আমি তো পথিকই। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা, আর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ...

—ওরে বাবা, হয়েচে, হয়েচে, আমার আর মাথাটা খারাপ করে দিও না। তোমারও দেখছি, আমার মায়ের মতো বকবক করা স্বভাব।

—একটু জল খাওয়াবে ?

—ঘাম মরেছে ? তা না হলে অসুখ করবে।

—মরেছে।

—আমাদের বাগানে টিউবয়েল আছে। আমি ঘ্যাচং ঘ্যাচং করছি। তুমি জল খাও। পারবে তো।

বাগানটা একেবারে ছবির মতো। কত রকমের ফুল। কেয়ারি করা গাছ। মাঝে মাঝে ফলের গাছ। সবুজ ঘাস। পেয়ারা গাছে বড় বড় পেয়ারা ঝুলছে। বাতাবি লেবুর গাছ। বাগানের মাঝখানে একটা গোল বাঁধানো জায়গা। সেইখানে হ্যান্ডপাম্প। মেয়েটা হ্যাঁচ হ্যাঁচ করছে, আমি জল খাচ্ছি। হঠাৎ মেয়েটা পাম্প করা ফেলে, গেটের দিকে বাবা, বাবা, করে ছুটল। ভদ্রলোককে দেখেই আমার গা হিম হয়ে গেল—আমাদের হেডমাস্টারমশাই, রবিবাবু। সট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। হয়তো ভাববেন, ফ্রি করে দিয়েছি, তাতেও হল না, আবার বাড়িতে এসে ঢুকেছে। লুকিয়ে থাকা গেল না, অঞ্জনা চিৎকার করল, পথিক এদিকে এসো, সামনে গিয়েই নমস্কার, টিপ করে—

—আমার খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল, তাই।

—তুমি আমার বাড়ি জানতে না ?

—আজ্ঞে না।

—তোমাদের তো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গেছে, এতক্ষণ কী করছিলে !

—বিহারীদের কাঠকল থেকে কাঠের কুঁচি নিচ্ছিলুম।

—কী করবে ?

—মা গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে ঘুঁটে দেবে আর উনুন জ্বালাবে।

—বাইরের ওই বস্তাটা তোমার ?

—আজ্ঞে।

—ওইটা মাথায় করে এতটা পথ যাবে ? এসো ভেতরে এসো।

—স্যার ! আমি যাই। আমি খুব নোংরা হয়ে আছি।

—তাতে কী হয়েছে ? ভেতরটা পরিষ্কার আছে তো।

কী করে বলি নেই। কিন্তু সত্যিই নেই। সেই মদনা ব্যাটা, যা-তা একটা জিনিস দেখিয়েছে। আমার বাবা কেন মাকে ছেড়ে চলে গেছে, মেয়েদের দুপুরের মজলিশে তার হরেক ব্যাখ্যা আমি শুনেছি। ডোবার ওপারের কুলগাছে কুল পাড়তে গিয়ে আমি বুকখোলা মেয়ে দেখেছি। শীতের রোদ খাচ্ছে।

আমি ছোট বলে কেউ গ্রাহ্য করেনি। বরং কমবয়সীরা এসে বলেছে—তোকে তুলে ধরছি, ওপরের ডালে অনেক পাকাপাকা আছে। সত্যিই তুলে ধরত, কারণ তারা জানত, আমার বাবা এই এদের মহল্লার জামাই।

ছবিতে আঁকা বাড়ির মতো বাড়ি। এত পরিষ্কার মেঝেতে পা রাখতে ভয় করছিল। একটা ঘর, তার দেয়াল নেই বললেই হয়। বড় বড় কাঁচ ফিট করা জানলা। মাঝখানে ঝকঝকে মেহগিনি কাঠের টেবিল। এক মাপের চেয়ার। ঘরের কোণে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। হাল্কা ফুলের গন্ধ। সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাকে একটা রোগে ধরেছিল, ভাল কিছু দেখলেই কেঁদে ফেলা। আমার চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে—স্যার বললেন, কী হল ? কান্না কিসের ?

ফট্ করে বলে বসলুম—আপনি যদি আমার বাবা হতেন !

—আমি তো তোমার বাবার মতোই। তা না হলে, তোমার লেখাপড়া, তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার তো কোনও কারণ ছিল না। আমার এই একটাই মেয়ে। পাকা বুড়ি। তুমি আমার একটা ছেলে। তবে কথা দিতে হবে, শিক্ষায়, চরিত্রে তুমি আমার মুখ রাখবে।

—স্যার, আমি তাহলে আসি।

—কোথায় যাবে। লুচি, বেগুনভাজা খেয়ে যাবে।

—না স্যার। আমার মাকে না দিয়ে ভাল কিছু খেতে পারব না।

—তোমার মায়ের জন্যে বেঁধে দেওয়া হবে আলাদা করে।

—না স্যার, মা খুব রাগ করবেন। আমি যাই। আমার জন্যে পেঁয়াজ পান্তা আছে।

অঞ্জনার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন—এ কে ?

ততক্ষণে আমি রাস্তায়। আমার মাথায় সেই বিরাট বোঝা। কাঠের গন্ধ। আমার হাতে সেই লাঠি। মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। বড়লোকের বাড়ির সাজগোজ করা ছেলেরা ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে সুন্দর সুন্দর মায়েদের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। চতুর্দিকে সুখ তার মধ্যে দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি। আমার সুখ একটাই—এত কাঠ দেখে মায়ের খুব আনন্দ হবে। সরলামাসী বলবেন—উঃ, তারক একটা ছেলে বটে।

সেই রাতে এক কাণ্ড হল। সারাজীবন বয়ে বেড়াবার মতো একটা ঘটনা। রাত আটটা সাড়ে আটটা। বাবা এল, প্রচণ্ড মদ খেয়ে। এসেই বললে, কিছু জিনিস আমি আমার ও-বাড়িতে নিয়ে যাব। মা বললে, নিয়ে যাও।

ভাল ভাল কাঁসার যে সব বাসন ছিল, টেনে হেঁচড়ে বের করল খাটের তলা

থেকে। দেয়াল ঘড়িটা চেয়ারে উঠে টলবল টলবল করে নামাল। এই সময় সরলামাসী মাকে তরকারি দিতে এলেন। জিনিসপত্র টানা হ্যাঁচড়া দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন,

—এসব নিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে, বাবা সরলামাসীর দিকে ঢুলুঢুলু চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আজ তোমাকে কী দেখাচ্ছে মাইরি। কোথায় রাখবে তোমার যৌবন। সরলামাসী বললেন, মুখ সামলে কথা বলুন। আপনার লজ্জা করে না। নিজের বাচ্চা ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে।

—তোমার বুক সামলাও, তাহলে চেষ্টা করব মুখ সামলাবার।

—আপনার এত অধঃপতন। কোথা থেকে কোথায় নেমেছেন আপনি!

—তোমাকে নিয়ে আমি নরকেও যেতে পারি, পিয়ারী।

কথা শেষ করেই সেই মাতাল অসভ্য লোকটা সরলামাসীকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল মেঝে থেকে। সরলামাসীর পায়ের দিকে কাপড় ঝুলে গিয়ে একেবারে বেআব্রু। বুকের কাপড় সরে গেছে। তাঁকে খাটের দিকে নিয়ে চলেছে জানোয়ারটা। সরলামাসী চিৎকার করার চেষ্টা করছেন। ভয়ে গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে যত হাত পা ছুঁড়ছেন, ততই সব খুলে যাচ্ছে। হাত দিয়ে লোকটার মুখ আঁচড়াবার চেষ্টা করছেন। পারবেন কেন? বিশাল বলশালী একটা লোক। মা ছুটে এসে লোকটার জামার পেছন দিকটা ধরে টানছেন, আর বলছেন, একটা কিছু কর খোকা।

লোকটা বলছে—অনেকদিন তুমি দেখিয়ে বেড়াচ্ছ। আজ তোমার শেষ দিন।

মা চিৎকার করছেন, এ কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। ও রে খোকা! ডাক না, লোকজনকে ডাক না।

সরলামাসীকে বিছানায় ফেলেছে। ছেঁড়া খোঁড়া শুরু হয়ে গেছে। মাসী কাঁদছে। আমি রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করতেই লোক জড় হয়ে গেল। শুরু হল লোকটার বেধড়ক ধোলাই। মা সরলামাসীর গায়ে একটা চাদর টেনে দিলেন। সেই লোকটা, জানি না, সে আমার বাবা কি না!, মার খেতে খেতে, মার খেতে খেতে এক সময় অজ্ঞান হয়ে গেল। একবার শুধু করুণ কণ্ঠে বললে, দেখ্ খোকা আমাকে কী মার মারছে।

যারা মেরেছিল, তাদেরই কয়েকজন মুখে-চোখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে একটা রিকশায় তুলে দিয়ে বললে, যা, জানোয়ারটাকে ওই পট্টিতে ফেলে দিয়ে

আয়।

মাকে একজন কানে কানে বলে গেলেন, ভদ্রমহিলাকে ঘিরে বসে থাকবেন, তা না হলে সকালে দেখবেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। খুব সাবধানে রাখবেন। একেবারে একলা রাখবেন না। তাহলে কিন্তু বিপদ হবে।

হঠাৎ চন্দ্রদাদু এসে গেলেন। যেন ভগবান পাঠিয়ে দিলেন। সব শুনে বললেন, ছি ছি, সঙ্গদোষে মানুষ কোন অধঃপাতে যায়। যাই ডাক্তার ডেকে আনি। ঘুমের ওষুধ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। এসব লোককে সমাজে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। নিজের বউ, ছেলের সামনে এ কী দুর্মতি।

মা কাঁদছেন, আর আমাকে ফিসফিস করে বলছেন—দেখ না, তোর বাবাকে কোথায় নিয়ে গেল। মদ খেলে কি মানুষের মাথার ঠিক থাকে। দোষ তো সরলার। এই সময় এল কেন? ও তো জানে, ও যেখানেই যায় লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। আমার সঙ্গে চন্দননগরে গিয়েছিল জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে। তিনটে মাতাল ওকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সে কী কেলেঙ্কারি।

—বাবা, না জানোয়ার।

—মানুষটা খুব সরল রে, যা ভাবে তাই করে।

—হ্যাঁ পাইখানা পেলে পাইখানা, পেচ্ছাপ পেলে পেচ্ছাপ।

ডাক্তারবাবু এসে সরলামাসীকে একটা ইনজেকসান দিলেন। আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে লোকটা ওই অল্প সময়ের মধ্যে। বাইরে কিছুক্ষণ জটলা হয়ে যাবার পর যে যার সরে পড়ল। কেউ কেউ আবার বলে গেল—বউটাও তো সুবিধের নয়, গস্তানি মাগী। তা না হলে স্বামীকে বাজারে মেয়েছেলে ধরে এনে দেয়! আড়কাটি। নিজের বউ-ছেলের সামনে কেউ ওসব করার সাহস পায়। হাতের কাছে তো চেলাকাঠ ছিল। খাটের পায়া ছিল। মজা দেখছিল, মজা।

বাবাকে ছেড়ে মাকে ধরে টানাটানি। এক সময়ে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। পাড়া একেবারে শুনশান। সেই সময় আমার মনে হল, একবার দেখলে হয়, রিকশায় করে লোকটাকে কোথায় পাচার করে দিল। সেই প্রথম ডোবার ওপারের নিষিদ্ধ পল্লীতে গেলুম। সবাই তো মানুষ। মানুষ ছাড়া তো কিছু নয়, তবু আমার কী ভয়। মাঝখানে একটা মাত্র ল্যাম্পপোস্ট। চারপাশে ছড়ানো বস্তী। সরু সরু গলি। কোনওটা ছ্যাঁচা বেড়া, কোনওটা টিন, দরমা, টালির ঘর। এর মধ্যেও অবস্থার তারতম্য। দিশি মদের গন্ধ, নর্দমার গন্ধ।

পোস্টের আলোটার কাছে সুতোর মতো ধোঁয়া পাক মারছে। বেশ রাত। তাই বাইরে আর কেউ নেই। সব ঘরে ঢুকে পড়েছে। হাসি-কাশির শব্দ। মাসীরা বাইরে বসে হাতপাখার বাতাস খাচ্ছে। একটা ঘরে একটা মেয়ে গুমরে কাঁদছে। মাঝে মাঝে চড়চাপড়ের শব্দ। শুধুমাত্র বুকের কাছ থেকে সায়া পরা একটা মেয়ে, মদে চুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে বললে—তোর প্যাঁচার ঘুগনি আজ আর কেউ খাবে না রে ছোঁড়া, আজ রক্ষেকালী পুজো। বলেই আমার এক ইঞ্চি দূরে থুতু ছিটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আর এক পা এগোতে ইচ্ছে করল না। ভেতরে অনেকটাই ঢুকেছিলুম। ফিরে আসছি, এক মোটা মাসী খ্যানখ্যানে গলায় ডাকল—এই ছোঁড়া, চোরের মতো ঘুরঘুর করছিস কেন রে। তোর ধান্দাটা কী ? ছুটে পালালে, চিল্লে পাড়া মাত করবে। তাই কাছে গিয়ে মিষ্টি করে বললুম—আমার বাবাকে খুঁজতে এসেছি। মাসী একটা গালাগাল দিয়ে বললে—সব বাবারা ন্যাংটো হয়ে মাকে নিয়ে শুয়ে আছে। বদমাইশ ছেলে, ঘাড় টিপলে দুধ বেরোবে, এখানে বাবা খুঁজতে এয়েছেন।

গালাগাল, গন্ধ, ধোঁয়া, অসভ্য দৃশ্য, সব অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলুম। একটাই আশার কথা কোথাও কোনও মৃতদেহ দেখতে পাইনি। তার মানে তিনি মরেননি। সে-কথা মাকে জানালুম। মা বললেন, এক কাজ কর, তুই খাটে তোর মাসীর পাশে শো, আমি মেঝেতে শুচ্ছি। দু'জনেই একটু সজাগ থাকব কেমন। বলা তো যায় না।

আলো নিবে গেল। ঘুম আর আসে না। বসে আছি চুপ করে। সব থিতোবার পর, সব যেন আবার ফিরে আসছে একে একে। দগদগে, রগরগে হয়ে। তখন অতটা বুঝিনি, এই নিঝুম রাতে শামুকের মতো, সব খোল থেকে শুঁড় বের করে তেড়ে আসছে। কালো পর্দায় সাদা ছবির মতো। ডোবার ওপারে সেই বস্তী। মাসীদের বিশ্রী পোশাক, বসার ধরন, পিপের মতো চেহারা। সেই মেয়েটা। বুকে বাঁধা কালো সায়া। হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পা। মদে মুখটা খসখসে লাল, মাথার এলোমেলো চুল উড়ছে। জড়ানো গলায় বলছে, এই ছোঁড়া। সেই মাসীটা বলছে এখানে খদ্দের খুঁজছিস। হিন্দুস্থানী পাড়ায় যা। ওখানে ছোঁড়াদের ডিম্যান্ড। সে আবার কী। আমি পালাচ্ছি। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। একজন পুলিস চোরের মতো ঢুকছে। সব দেখতে পাচ্ছি আবার।

একেবারে পাশে চিত হয়ে শুয়ে আছেন সরলামাসী। ধারালো মুখ, নাক,

এক মাথা চুল। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভারী বুক উঠছে পড়ছে। টান টান। ব্লাউজটা ফেঁসে গেছে। শাড়ি উঠে গেছে হাঁটু পর্যন্ত। ননীর মতো দুটো পা। ভারী কোমর। সেই লোকটা যখন পেটুকের মতো সরলামাসীকে পাঁজাকোলা করে তুলছিল তখন আমি অনেক কিছু দেখেছি। একটা পুরুষ মানুষ জানোয়ারের মতো কী ভোগ করতে চায়, আমার জানা হয়ে গেছে। ভীষণ ভাবে জানা। সরলামাসী আর যেন আমার কাছে মাসী নয়। ডোবার ওপারে বস্তীর সেই রাতজাগা মেয়েটার মতো। গলায় একটা তাগা। বুকটা খোলা। চওড়া পিঠ। ভারী কাঁধ।

হঠাৎ মনে হল, বিশ্বনাথ সরকার আমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তারক সরকার, তুমি বিশ্বনাথ সরকার-এরই ছেলে। পালাবে কোথায়। সব মানুষেরই জন্মবৃত্তান্তে আগুনের আঁচ। সে সব একই মনের ব্যাপার। মা, চম্পা সরকার ঘুমকাতুরে। মেঝেতে মড়ার মতো ঘুমোচ্ছেন। আমি সরলামাসীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লুম। পাতলা ঠোঁটের নীচেরটা ফুলে আছে, রক্তাক্ত। মুখে লাগছে গরম নিঃশ্বাস। মিষ্টি আরকের মতো গন্ধ। আমার হাত কাঁপছে। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। রবিবাবু বলছেন—তারক, শিক্ষা আর চরিত্র। চন্দ্রদাদু বলছেন, পুজো, ধ্যান, জপ। আমার হাত সরে এল। আস্তে আস্তে বালিশে মাথা রাখলুম। রাস্তার আলোর এক চিলতে বিছানায় এসে পড়েছে। ঘুম আয়, ঘুম আয়! আমার বাঁ গালে লম্বা চুলের গুছি সাপের মতো নড়াচড়া করছে। হঠাৎ সরলামাসীর ভারী বাঁ-পাটা ভাঁজ হয়ে আমার পায়ের ওপর উঠে পড়ল।

তারকের ভেতর যে গুহ্যইতটা চিরকাল খেলা করছে, সে বললে, তারক জ্ঞান বাড়া, অভিজ্ঞতা বাড়া। কেউ কিছু বলবে না। কেউ জানতেও পারবে না। এই তো তোর জানার বয়েস। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাত নেমে এল। এত, এত, এত সুন্দর! সারাটা রাত আমি ঘুরে বেড়ালুম।

ভোরবেলা আবিষ্কার করলুম—তারক সরকার পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে। এমন কিছু এসেছে শরীরে যা একমাত্র পুরুষেই আসে; কিন্তু মনে হল, বড় পাপ, বড় লজ্জা, বড় গোপনীয়।

॥ দুই ॥

বলেছিল। আমার অনেক গুরুর এক গুরু বলেছিল ভায়া! আর্টই বলো আর কালচারই বলো, সেরা আর্ট হল, ধরা না পড়া। সেরা টেলার কাকে বলবে, যে তোমার শরীরের সমস্ত ডিফেক্ট মেরে জামা কোট-প্যান্ট তৈরি করতে পারে। পরা মাত্রই তোমার ভোল পাল্টে যাবে। শোনো বৎস! জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতজন, মহাজন সব হল দোতরা—উদর আর শিশ্ন। বুং বুং আ বুং, বুং বুং আ বুং। মনটা আমার ফসর ফসর করে ভোলা মন। কেন করে? এ, বি, সি, ডি, একস, ওয়াই, জেড, কেউ সত্যি কথা বলবে না। এই আসল কথাটা না বলাই হল আর্ট। বাইরে মহাত্মা, দরদী, মরমী, ভেতরে কুকুর, বেড়াল, হায়না, হাড়গিলে, ছারপোকা, তেলাপোকা। ভেতরে খাব খাব, বাইরে খাওয়াব খাওয়াব! বুকে হাত দিয়ে বল শালা, অন্যের ভাল হলে, উন্নতি হলে, তোর আনন্দে নৃত্য করতে ইচ্ছে করে! সুন্দরী মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালে ভেতরটা রামছাগলের মতো, ম্যা ম্যা করে ওঠে? না, ভেতর থেকে একটা কালপুরুষ বেরিয়ে এসে কাঁকড়া বিছের মতো নাচতে থাকে। যা হয়, তা চেপে যাওয়াটাই আর্ট। কেউ কারও নয়। যতক্ষণ স্বার্থ, ততক্ষণ সানাইয়ের প্যাঁপোর পোঁ। স্বার্থ শেষ, মালেরা হাওয়া। দুনিয়া এক আজব জায়গা ভাই। বলি দেওয়ার জন্যে একটা ছাগলকে হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। গলায় জবার মালা। ছাগলটা সেই মালা খাদ্য ভেবে মনের আনন্দে চিবিয়ে যাচ্ছে। সাপে ব্যাঙ ধরেছে পেছন দিক থেকে। একটু একটু করে ঢুকছে মুখে। ব্যাংটার মুখের কাছ দিয়ে একটা পোকা উড়ে যাচ্ছিল, সেই অবস্থাতেও কপাক করে গিলে খেয়ে ফেললে? বেদীর ওপর খোদাই করা পাথরের সাপ। সর্প দেবতা। সবাই বাটি বাটি দুধ ঢালছে। যেই জ্যান্ত সাপ কিলবিলিয়ে এল, চিৎকার— মার, মার। মন্দিরের সেবকের কাছে ক্ষুধার্ত মানুষ খেতে চাইলে। বললে, ভাগো ভাগো। যেহেতু দেবতা খান না, সেই হেতু তাঁর সামনে নৈবেদ্যর পাহাড়। এই তো তোমার জগৎ ভাই! এখানে আর কত কপচাবে বড় বড় বমবাস্টিক বুলি—লোকহিতায়, জগদ্ধিতায়। কাঠকুড়ুনির মতো ভাগ্য, কুড়িয়ে বাঁচো। ফাঁসার দিন এলে ফেঁসে যাও। এসেছিলে, সেটাও যেমন কোনও ঘটনা নয়, চলে গেলে, সেটাও কোনও ঘটনা নয়। বিষয়সম্পত্তি, ব্যাঙ্কব্যালেন্স কী রেখে গেলে। সেইটাই হল পরবর্তীকালের মোদ্দা কথা। আমার বাবা কিছু রেখে গিয়েছিলেন। মনটা বেশ মজে ছিল। আর্টিস্ট

ডাকিয়ে একটা অয়েল পোর্ট্রেট করে একটু অয়েল দেবার চেষ্টা করেছিলুম। লোকে বললে, ছেলে দেখেছ, রামভক্ত জাম্বুবান। আবার এও বললে, বাপের পয়সায় লপচপানি, তাই একটু শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে। যেই নিজের হিম্মতে একটু রোজগারপাতি বাড়াল, মনে হল বুড়োটা সিঁড়ির মুখে ঝুলে আমার ক্রেডিটে ভাগ বসাচ্ছে। হাটাও। একেবারে ঠাকুরঘরে চালান করে দাও। সিঁড়ির মুখে এখন সিনারি ঝুলছে। ইয়ে হায় জিন্দেগি।

আমার এই গুরু এক বহুতল বাড়ির টপ ফ্লোরে বসেন। অফিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড়বাবু। আষ্টেপৃষ্টে টেলিফোন। ভদ্রলোকের খুব হর্সপাওয়ার। মন্ত্রীদের গলা টেলিফোনে অনবরতই ক্যাঁক ক্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক করছে। ম্যানেজমাস্টার। যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন। ডোবা নৌকোকে ঠেলে ভাসাতে পারেন। চোপসানো বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে পারেন। একটা হাত টেবিলের ওপরে আর একটা হাত নীচে। নীচের হাতে কিছু না ঠেকালে ওপরের হাত সচল হয় না। বলেন, প্যারালিসিস আছে। ফাইলপত্তর অচল হয়ে থাকে। বেশি ট্যান্ডাইম্যান্ডাই দেখালে পাকা ঘুঁটি কাঁচা করে দেন। সাপলুডো দেখেছ চাঁদু! সাপের দুটো দিক ন্যাজা আর মুড়ো। ন্যাজায় নৈবেদ্য দিলে মুড়োয় প্রোমোশান। আর মুড়োয় খোঁচা মারলে ন্যাজে ডিমোশান।

হাসতে হাসতে সর্বনাশ করবে। আহা! সত্যিই তো, সত্যিই তো! বড্ড সাফার করছেন! দেখছি, দেখছি, কী করা যায়। মন্ত্রীর টেবিলে ফাইল গেছে। ওপর দিকে তুলে দেব। ভাববেন না। তলা থেকে টেনে ওপরে প্রেস করে দিলেই হয়ে যায়।

কিন্তু করব না। কেন করব না! কেসটা সোজা আমার হাতে আসেনি। এক মুরুব্বি ধরেছিল। সে ফোস করছে, গম্ভীর গলা, শৈলেন বিশ্বাসের কেসটা তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার করে দেবেন। যেন, আমি তার বাপের চাকর! সারা জীবন ঘুরে মরো। যদি প্রপার চ্যানেলে আসত। সেটা কোন চ্যানেল ? কেন ইংলিশ চ্যানেল। টুলে বসে আছে মোহন। মোহনকে ধরো। সে ভালমানুষের মতো মুখ করে হাতের পাঁচটা আঙুল দেখাবে। ফাইভ। ব্যাস আর কোথাও কোনও বাধা নেই। ফাইল যেন সকালের বুড়ো। পার্কে ছড়ি হাতে তড়বড়িয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

আমার গুরুর আবার পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। বলতেন, পান খেলে মানুষকে খুব ফ্রেন্ডলি দেখায়। লোকে মনে করে সহৃদয় আপনজন। কথা

বলতে বলতে পেছনের জানালায় উঠে গিয়ে পিক ফেলে এলেন। তাম্বুল রস নামছে— বারো থেকে ভূমিতলে। ওদিকে রাস্তা। অনবরত লোক চলেছে।

—ফেলছেন ? কারও মাথায় পড়লে ?

—পড়লে পড়বে। এই তোমার ভগবানকে দেখো না। প্রতি সেকেন্ডে একটা করে ইট ফেলছেন হেভন থেকে। ভূমণ্ডলে লোক পাস করছে। যার মাথায় পড়ল, তার হয়ে গেল। বলো হরি। কিছু করার নেই তারক। এইটাই হল খেলা।

আমি দেখলুম, নতুন কিছু শেখার নেই। নিজের জীবন দিয়েই মোটামুটি সব শেখা হয়ে গেছে। সেই রাত— ধোলাইয়ের রাত, সরলামাসীকে দেখার রাত, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের রাত। আমার জীবনের একটা ঘুরপাকের রাত।

সেই সকাল আগের আর পাঁচটা সকালের মতো ছিল না। ভোর হচ্ছে। সরলামাসীকে জড়িয়ে শুয়ে আছি। দেহটা কিশোরের, মনটা সমর্থ এক পুরুষের। মনে একটা ভয়, আবার ভীষণ একটা ভাললাগা। তার নাম প্রেম কি না, তখনও বোঝা হয়নি। সে এমন এক আবিষ্কার যা মুখ ফুটে কারোকে বলা যাবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, কেন নেশার ঘোরে সব বাঁধন হারিয়ে বাবা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কেন এ-পাড়ার কিছু লোক সরলামাসীর বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করে। গভীর রাতে কেন সিটি মারে। কেন সেদিন স্কুলের উঁচু ক্লাসের একটা ছেলে সরলামাসী যখন নিচু হয়ে কল থেকে জল নিচ্ছিল, তখন মাল বলে ছুটে পালিয়েছিল। শরীরে যা আছে তা বলার নয়। আমি আমার বাবাকে ক্ষমা করে দিলুম। ও ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

নিজেকে সামলে, সাবধানে ঢেকে, মা উঠে পড়ার আগে নামতে যাচ্ছি খাট থেকে সরলামাসী বললে,

—এখনও সকাল হয়নি, আর একটু শো। আমার ভীষণ ভয় করছে।

—তুমি আমার ওপর রাগ করেছো ?

সরলামাসী আমাকে জড়িয়ে ধরে, পিষে ফেললে, বল, তুই আমাকে কোনওদিন ছেড়ে যাবি না ! বড় সুখরে ! তোকে নিয়ে আমি ভুবনেশ্বরে যাব, পুরীতে যাব। তুই আমার। তুই শুধু আমার।

জীবন এক বিচিত্র খেলা। যেন মাছ ধরা। সাহস করে ছিপ ফেললে কিছু না কিছু উঠবেই। চন্দ্রদাদুমানুষের ভেতরটা দেখতে পান। একটা কথাতেই আমার সেইরকম মনে হল। পুজোর ফুলে হাত দিতে যাচ্ছি, বললেন, আজ

আর স্পর্শ কোরো না, তুমি অপবিত্র হয়ে গেছ। তোমার ক্ষয় হচ্ছে। তুমি অসৎ সঙ্গে পড়েছ। তোমার চোখের নীচে কালি। তুমি আগের মতো সোজা আমার দিকে তাকাতে পারছ না। তোমার পতন অনিবার্য। তোমাকে পেতনীতে ধরেছে। তুমি আর আমার ত্রিসীমানায় এসো না। বাঘ একবার নরমাংসের স্বাদ পেলে তাকে আর ফেরানো যায় না।

আমি কেঁদে ফেললুম। একমাত্র মানুষ, যাঁকে আমি ভালবাসি। যাঁর নির্দেশে আমি আমার জীবন চালাতে চাই। আবার একটু স্বার্থও আছে। চন্দ্রদাদুর দানে আমাদের সংসার চলে। এসো না,মানে চাকরি চলে যাওয়া। শাড়ি, চাল, ডাল, আনাজ, সন্দেশ, ফল, সব বন্ধ হয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নাটমন্দিরে গিয়ে বসলুম। যেন একটা কুকুর! চন্দ্রদাদু আমার পাপ জেনে গেছেন।

কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে থাকার পর আমার ভেতর থেকে একটা শয়তান বেরিয়ে এল। ঠিক আছে, মানুষ যাকে পাপ বলে, অন্যায় বলে, আমি তা করব, কিন্তু পুণ্যবানের মতো। কেউ ধরতে পারবে না। মুখই হল মনের আয়না। সেই আয়নাটাকে নির্মল রাখতে পারলেই তো হল। আর তক্কে তক্কে থাকব, অন্যের গোপন-জীবনের কথা কিছু জানা যায় কি না। এই যে চন্দ্রদাদু, এঁর কি কোনও গোপন দিক নেই।

চোখে জল। চন্দ্রদাদুর সামনে গেলুম। একটা একটা করে বেলপাতা বাছছেন।

—বলো, কি বলতে চাও?

—অন্যায় করে ফেলেছি। আর করব না। মায়ের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি।

—তোমার বয়েস কম। ইন্দ্রিয়ের ঘুম ভাঙছে। শিব তুমি সাবধান হও।

—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

—আমিও ওই বয়েস পেরিয়ে এসেছি। সৎভাব, সৎগ্রন্থ, সৎজীবন, ব্রহ্মচর্য, সমস্ত সাফল্যের এই হল মন্ত্র। মনে রাখবে, তোমার বীজ তেমন ভাল নয়। মেয়েদের থেকে দূরে থাকবে। এই বয়েস বড় সাংঘাতিক বয়েস। ভাল করে লেখা-পড়া করো। মানুষ হও। মায়ের দুঃখ দূর করো।

একটা জোড়াতালি হল। ভবতারিণীর সামনে হাপুস হুপুস খানিক কান্না হল। চোখের জলের বেশ একটা পাওয়ার সেই বয়েসেই বুঝে গিয়েছিলুম। মা, বলে কাঁদতে পারলে সবাই ভাবে— ব্যাটার ভেতর ভগবৎ প্রেম মিছরি

হচ্ছে। ব্যাটা, পবিত্র, তপস্বী। চন্দ্রদাদু বললেন, চোখের জলে পবিত্র হও যত কাঁদবে তত তাঁর কাছে যাবে।

এই চন্দ্রবিন্দুযুক্ত তিনিটা কে ? ব্যাকরণে আছে, জীবনে আছে কী ? আমার মায়ের ভর হত। সেটা হিস্টিরিয়া নয়। ভৌতিক আবেশ অথবা ঈশ্বরীয় আবেশ। মা সেই থেকেই ভাবালু। সেজে-গুজে গুছাইত হতে পারলেন না বলে, অধম ডালিম পেট দেখিয়ে,পিঠ দেখিয়ে, রেল কোম্পানির মালবাবু বিশ্বনাথ সরকারকে বগলদাবা করে সরে পড়ল। এর মধ্যে এল প্রবল নিম্নচাপ সরলামাসী। লে হালুয়া, বিশ্বনাথ সরকারকে তাহলে কে বেশি টানছে ! কে ফার্স্ট : ডালিম না সরলামাসী ! তা, সেই তিনি করলেনটা কী ! কাঁচকলা করলেন। উপোসের ব্যবস্থা পাকা। সেটা আরও পাকা করে দিল সবলামাসী। বিশ্বনাথ সরকার আপাতত এ তল্লাটে ভিড়ছে না। দু'চার পয়সা যা ঠেকাত তাও হয়ে গেল।

উপদেশ খুব উপকারী। আর সব উপদেশই প্রায় একরকম। গোটাকতক অবাস্তব প্রস্তাবের মধ্যে ঘোরা ফেরা— সদা সত্য বলিবে। আবার ধর্মের উঁচু থাকে উঠে মহাপুরুষ বলছেন— জগৎ মিথ্যা। গান গাইছেন, এ সংসার ধোঁকার টাটি, খাই দাই আর মজা লুটি। তা সবটাই যদি ধোঁকা হয়, তাহলে সত্য কথা বলে লাভটা কী ! সত্য বলে তো কিছু নেই। মিথ্যের সংসারে বসে সত্য কথা বলবে। এজলাসে দাঁড়িয়ে সাক্ষী বলছে, সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না, আগাপাশতলা মিথ্যে বলে চলে গেল। তার মানে প্রথম উপদেশ ক্যানসেল। ধোপে টেঁকল না। দ্বিতীয় উপদেশ সৎপথে থাকবে। তার মানে পথে থাকবে, পেটে কিল মেরে। এই আমরা যেমন আছি। যেমন সরলামাসী আছে। পাড়াসুদ্ধ লোক তাকে টেনে নামাবার জন্যে রাতের ঘুম ছেড়ে দিয়েছে। এপাড়ার তিনজনকে জানি, যারা দোতলার জানলায় দূরবীন ফিট করেছে। তেনারা আবার খুব জ্ঞান দেন। কথায় কথায় বলেন— অমুক লোফার, তমুক লুজ ক্যারেক্টার। তারাই সবার আগে এসে, বিশ্বনাথ সরকারকে ভেঙিয়েছিল। নরেন সাধু এ-পাড়ার মুরুব্বি। সবাই জানে জ্বাল ওষুধের কারবারী। সবাই গিয়ে তার উমেদারী করে। আগাপাশতলা তেল মাখায়। এমন কী খাটালের মালিক মতিয়া। তারও কী দাপট ! নাও সৎ পথে থাকো, আর ডোবার কলমি তুলে এনে, বোগড়া চালের ভাতের সঙ্গে সেদ্ধ করে খাও। ইয়ারকি মারার জায়গা পাওনি ! সৎ পথে থাকো !

মা দেখি বসে বসে কাঁদছে। ব্যাপারটা কী ? দত্তগিন্নি এসে বলেছে—বড়

বউয়ের ছেলে হয়েছে। বাচ্চা কোলে, সংসারের কাজকর্ম তেমন করতে পারছে না, তা তুমি তো বসে না থেকে আমাদের রান্নার কাজটা তুলে দিতে পারো। গতর যখন আছে মা, সেটা খাটাও। স্বামী তো ওইরকম। এক চ্যাঙলাকে নিয়ে মজায় আছে।

—সুযোগ যখন পেয়েছে, তখন তো বলবেই মা। আরও কতজন কত কী বলবে। ও নিয়ে মাথা খারাপ কোরো না। এই তো সরলামাসীর নামে যা-তা বলছে। বলছে, সরলামাসী ডোবার ওপারের বস্তিতে গিয়ে ব্যবসাটা খোলাখুলি শুরু করলেই পারে। যাও তো, তুমি তোমার কাজে যাও।

—আমার আবার কাজ। এই দাওয়াটাই সকাল থেকে ছ'বার ঝাঁট দিয়েছি। রান্নাবান্নার পাট তো উঠেই গেছে।

পাড়ায় আমার আর এক গুরু ছিল কিশোরীদা। তাঁর থিয়োরি হল,মেলা কথা খরচ করিসনি। দুখানা আগে কষিয়ে দে থোবনায। যদি ফেরত দেবার হিম্মত দেখাতে পারে, তাহলে দুচার রাউন্ড আরও লড়িয়ে দাও। তারপর থানা-পুলিশ যা হয় হবে। কোর্টে গিয়ে উকিলে উকিলে তাল ঠুকবে। বড়লোকের ছেলে ছিল। মালকড়ি পাঁচভূতে চৌপাট করে দিয়েছে। এখন মেজাজটাই আছে। মটোর মেরামতি শিখে, নিজেদের পোড়োবাড়ির বাগানে একটা গ্যারেজ করেছে। রোজগার নেহাত খারাপ নয়।

কিশোরীদা বললে, চল তাহলে। আমার লঝঝড়টা বের করি। তোর বাপকে দুরদ্দা ঝেড়ে আসি। মাগীবাজি মাথায় তুলে দিচ্ছি। বউ ছেলে ফেলে ইল্লি মারছে। কলার ধরে টেনে এনে তোর মায়ের পায়ে ল্যান্ড করিয়ে দিচ্ছি। চম্পুটাকে বিয়ে করেছে ? তাহলে আপেলটার কী হবে !

—হাত-ফাত চালিও না, শুধু একটু কড়কানি। খরচপত্তর দেওয়া স্টপ করে দিয়েছে।

—ম্যাডাগাস্কার। চালাচ্ছিস কী করে ? গয়না বেচে ?

—সব নিয়ে গেছে।

—অ, সেই মালটাকে ডেকরেট করেছে। তা চল ইঞ্জিন থেকে পার্টস খুলে আনি।

এসে, আমরা ফেড়ে দি। মাসীমা আর কত উপোস করবে।

বড়লোকের ছেলে। লাল টুকটুকে চেহারা। চকলেট রঙের গেঞ্জি। কালো, কোঁকড়ানো চুল। ধারালো মুখ। পাড়ার হিরো। মেয়েরা সুর তুলে ডাকে, কিশোরীদা।

—তুই ডেরাটা জানিস ?

—হালসীবাগান ।

—হালসীবাগান ! হালসীবাগান বললে লোকেট করা যাবে ? কে চিনবে ?

—লালপাড়া থেকে জেনে আসব ?

—তুই ? তুই যাবি ? কার কাছে যাবি ? দাঁড়া আমি যাই । আমার একটা ঠেক আছে । তুই এখানে বোস ।

—তোমার গ্যারেজের চালায় লাউগাছটা বেশ লতিয়েছে । দু'একটা ডগা তুলব ? আজকের দিনটা তা হলে হয়ে যাবে ।

—গোটা গাছটাই তুই উপড়ে নিয়ে যা ।

কিশোরীদা বেরিয়ে গেল । ফিরে এল পাক্কা দেড়ঘণ্টা পরে । মুখে মদের গন্ধ ভক ভক করছে ।

—তুমি এই সাতসকালে টেনে এলে ?

—মন্দিরে গেলে চরণামৃত খেয়ে আসে, লাল মহল্লায় গেলে মাল খেতে হয় । একটু হাই হয়ে এলুম । পেটাপিটি করতে হবে তো !

—ঠিকানা পেয়েছো ?

—পেয়েছি । তোর বাপ তো বউভাতের ভোজ খাইয়ে গেছে । তন্দুর, চাঁপ, বোতল । তোর বাপ একটা জিনিস ।

কিশোরীদার বারে বারে বাপ বলাটা আমার ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছিল । যতই হোক আমার বাবা তো । প্রেমিক বাবা । হালসীবাগানে সামান্য খোঁজপাতেই আস্তানাটা পাওয়া গেল । মাঠকোটা বস্তী । দোতলা । বেশ মজার ঘর । পাহাড়ী বাংলোর মতো । কাঠের নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় বাইরে থেকে । রেলিং-এ দুটো সায়া ঝুলছে । কিশোরীদা বললেন, বুঝলি, এই হল সিগন্যাল । পাড়ার মেয়ে, সে যেখানেই যাক তার একই ধারা । ভেতরটা বাইরে ঝোলাবেই । রং দেখেছিস ? যেন মটোর গাড়ি । ডিপ ব্লু, ডিপ রেড । ব্রেসিয়ারটা ঝুলছে দেখ । সাইজ দেখেছিস ? কেন মানুষ ম্যাড হবে না । এদের শালা ফাঁদই আলাদা, আর আমাদের চরিত্র হল টিকটিকির ডিম । ফিনফিনে খোলা, একটু চাপ, মুচ মুচ মুচ । আমারই কেমন করছে । তিনটে পার্টস দেখেই ভেতরের ইঞ্জিন গড়গড় করছে । তোকে বলে রাখছি তারক, দামড়াটা যদি বাইরে থাকে আর মাল যদি একা থাকে আমি ইঞ্জিন ভিড়িয়ে দেবো । আমার কথা হল সুযোগের সদ্ব্যবহার । ফলটি দেখিলে হাতের কাছে, পাড়িয়া খাইবে সাথে সাথে । সরে আয়, সায়াটা গায়ে লাগছে । শরীর খারাপ

হতে আর বাকি আছে কী। রাতে আমাকে সরলামাসীর কাছে থাকতে হয় পাহারা দেবার জন্যে। বাইরের আঁচড় কামড়ের দাগ প্রায় মিলিয়ে গেলেও, মনের ঘা শুকোইনি। সকলের তাই ধারণা। আমার ধারণা অন্য। আমার ধারণা, বাবা সরলামাসীকে খোঁচা মেরে তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে গেছে। তোমার আছে, তোমার ভয়ঙ্কর আছে। তুমি মানুষকে পোকার মতো পুড়িয়ে মারতে পারো। সরলামাসী নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। সে আর মরতে চায় না, মারতে চায়। রাতের বেলা মনে হয়, সরলামাসীর খিদে পেয়েছে। ওরই মধ্যে একটু সাজে। কেমন একটা আনন্দ। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রথমে মনে করছে ছেলে চম্পা সরকার-এর ছেলে। আমারও ছেলে। রোজ সকালে এটা ওটা দিয়ে যায়, কলমিশাক,লাউশাক, পুঁইশাক, ডুমুর, কাঠকুটো। কিছু পরেই আমি ভাই। ছেলেবেলার কথা, নানা ভালবাসার কথা, মৃত স্বামীর কথা। ছোট্ট একটা প্রেমের কথা, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা। ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখার কথা। মায়ের প্রবল শাসন। গল্প করতে করতে যাচ্ছে, হাই উঠবে। সরলাদি হঠাৎ আড় হয়ে শুয়ে পড়বে। শরীরের ভাঁজ, পেছন, পা, বুক। সরলামাসী চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ক্রমশ যেন স্বপ্নে চলে যাচ্ছে। আমার দিকে তাকানোর চেহারা বদলে যাবে। ভালবাসা নেই। একটা উদ্দেশ্য ছিল। যেন কচি পাঁঠার দিকে তাকাচ্ছে অজগর। মদ না খেয়েও মাতাল। জড়ানো গলায় বলবে, এসো, এদিকে। কোথায় গেলে। সরলামাসী বিছানায় টানটান। দুটো পা নানা কায়দায় খেলছে। ভীষণ একটা যন্ত্রণা। যেন কাটা ছাগল। প্রথম দিন খুব ভয় পেয়েছিলাম। কী হয়েছে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুকে ডাকবো না কি। সাপ যে-ভাবে খপ করে ব্যাং ধরে সরলামাসী খপ করে আমাকে ধরল। তখন আমি তারক নই। সরলামাসীর যন্ত্র। যতদিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি, আমার আগের আমিটা আর নেই। দুটো আমি হয়ে গেছি—সকালের আমি মাঝরাতের আমি। চন্দ্রদাদুর মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বেজে গেল। দরজা বন্ধ হল। দেবতা ঘুমোলেন। জেগে উঠল আমার দ্বিতীয় আমি। সেই আমিটাও ক্রমশ পাকছে। সে আর সরলামাসীর হাতের আমি নয়। সে আমির হাতে সরলা। তার কল্পনা আছে, আবিষ্কার আছে।

কিশোরীদা বললে, কী হল? তোকে কী বললুম। সরে আয়। চল ওপরে।

—তুমি আগে চলো, আমার ভয় করছে।

—আমার প্ল্যান হল, আমি ঘাপটি মেরে পেছনে থাকব, যেই দরজা খুলবে, তোকে নিয়ে দড়াম করে ঢুকে পড়ব। তারপর আমার খেল।

ক্যাঁচ কোঁচ করে সিঁড়ি ভাঙছি। একটা বেড়াল তরতর করে নীচে নেমে এল। মুখে একটা কী রয়েছে। দরজার কড়া ধরে বার কতক টুক টুক শব্দ করে দাঁড়িয়ে আছি। দরজা আর খোলে না। আবার কড়া নাড়তেই পায়ের শব্দ। গলা পাওয়া গেল— এখন হবে না। এখন হবে না। পরে পরে।

মেয়ের গলা। কিশোরীদার মুখের দিকে তাকালুম।

ফিসফিস করে বললে— বল, আমি তোমার ছেলে।

—তোমার ছেলে, দরজাটা খোলো।

—সে আবার কে ?

—ওই যে বঁড়শীগলায় ছেলে।

ধড়াং করে দরজা খুলে গেল। সেই মহিলা। পাতলা বিস্কুট রঙের শাড়ি। ভেতরে শুধু ব্রেসিয়ার। মহিলা আরও সুন্দরী হয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, ও, আমার সোনা, কত বড় হয়ে গেছিস। তোর বাবাকে কতবার বলেছি—একবার নিয়ে এসো না, আমার ছেলেটাকে দেখি। তা বলে কী, ওরা না আমাকে ঝ্যাঁটা পেটা করবে।

মহিলা নিচু হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলেন। কিশোরীদা পেছন থেকে বললে, —ডালিম, এদিকে তাকাও। চিনতে পারছ ? তোমার একসময়ের নয়নতারা।

মহিলা আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সরলামাসী আমাকে শেষ করে না দিলে, এই জড়িয়ে ধরায় আমার কিছুই হত না। মহিলা জানতেও পারলেন না, আমার কী হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াতেই বুকের ফিনফিনে আঁচল এক ঝলকের জন্যে খসে পড়ে গেল। আমার ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

—আমার এখন আর মনে পড়ে না।

—তা অবশ্য অনেকদিন হল, তখন আমার বয়েসটাও অনেক কম ছিল। তবে তোমার শরীরটাও বেশ তোয়াজে আছে। বিলিতি চলছে বুঝি।

—সে খবরে কী দরকার। কেন এসেছ বলো।

—তোমার সেই বুড়ো কার্ত্তিকটার খোঁজে।

—কেন, তার খোঁজে কী দরকার ?

—তার আসল সংসার তো তোমার জন্যে ভেসে গেল।

—তার আমি কী করব। যাকে দেখে মজে মনে কী বা হাড়ি, কী বা

ডোম। মেয়েছেলে একটু গরম না হলে পুরুষদের ঘরে ধরে রাখা যায় না। সে তো নিজেও জানো। অমন খ্যাসখ্যাসে বউয়ের সঙ্গে তো আর রাত জমে না। আর রাতই যদি না জমল বিয়ে করে লাভ কী হল।

ডালিম এরপর এক বেধড়ক খিস্তি করল। কিশোরীদা আমাকে এক ধমক মেরে বললে— দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিস কী? নীচে যা। আমি কথা বলে আসছি। ডালিম বললে— ওর আর পাকতে দেরি কী? আমার দিকে কোন নজরে তাকাচ্ছে দেখেছ? ছেলে নয় তো, ছেলের বাপ।

—ওর আর দোষ কী। অমন জিনিস দেখালে দেখবে না; ছেলে তো!

তরতরিয়ে নীচে নেমে এলুম। রাস্তায়। গলিটা পাক মেরে মেরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। একপাল বাচ্চা একটা প্যান্ডেলে খেলা করছে। বিয়েটিয়ে আছে মনে হয়। লোকজন আসা-যাওয়া করছে। নাকে ভাল মন্দ রান্নার গন্ধ আসছে। কতদিন ভাল খাওয়া হয়নি। মাছের কালিয়া, মাংসর কোপ্তা। গরম লুচি। কত বছর হয়ে গেল। আমরা তো হাঘরে গরিব, তাই কাজে কম্মে কেউ আর আমাদের বলে না। রাস্তার কল থেকে অনেকটা জল খেয়ে নিলুম। কিছু নেই বলে এত খিদে পায়। হাঁটছি, তবে বেশি দূর যেতে সাহস হয় না, যদি হারিয়ে যাই।

রোজ মাইলের পর মাইল হেঁটে পা দুটো এমন হয়েছে, পথ পেলেই চলতে থাকে। হঠাৎ পেছন দিক থেকে কিশোরীদা এসে আমায় ধরে ফেললে। জোরে হেঁটেছে। তাই হাঁপাচ্ছে।

—একা একা যাচ্ছিস কোথায়? তুই কলকাতার রাস্তাঘাট চিনিস?

—আমি তো যাইনি কোথাও, একটু বেড়াচ্ছি। বেশ নতুন জায়গা।

—চল, সার্কুলার রোডের কোনও রেস্তোরাঁয় বসে একটু ভালমন্দ খাওয়া যাক্।

—তুমি তো জানো, আমি মাকে না দিয়ে কিছু খাই না।

—তার মানে?

—আমি ভাল খাব, মা খাবে না, এ আমি ভাবতে পারি না।

কিশোরীদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে তাকালুম। চোখে সামান্য নেশা। জল ছলছল করছে।

—কী বললি রে তুই। শালা, আমার নাম কিশোরী ঘোষ। বেপরোয়া, চরিত্রহীন, লম্পট, আমার চোখে জল এসে গেল। বাবা দেনার দায়ে সুইসাইড করার পর, আমাকে মানুষ করার জন্যে কী না করেছে। আমার মা সুন্দরী।

বাড়িটা বাঁচাবার জন্যে বোথরার বিছানায় শুয়েছে। আমার কাকার চরিত্র নষ্ট করেছে। আমি আর আমার দিদি যাতে ভিখিরি না হয়ে যাই। সে মায়ের জন্য আমি কী করেছি। শালা কিশোরী, তুই কী করেছিস। মায়ের গয়না বেচে মাগীর ফাঁদ দেখতে গেছিস। সেই মা আমার কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে পড়ে মারা গেল। বেওয়ারিশ লাস!

—তুমি কাঁদছ কেন?

—পায়ের ধুলো দে।

—কী করছ কী? রাস্তার লোক দেখছে।

কিশোরীদা হিপ পকেট থেকে চকচকে, চ্যাপ্টা মতো একটা কৌটো বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে,

—যাঃ, শালা মদের বাচ্চা। আজ থেকে মেয়েছেলেও শেষ। কালীবাড়িতে গিয়ে বুড়োদের মতো বসে থাকব সেও ভি আচ্ছা, তবু মেয়েছেলে, মাই, পাছা এসবের লোভে আর লাল পাড়ায় যাব না। কিশোরী! মেয়েছেলে দেখতে হলে লিঙ্গ শিবের কাছে বন্ধক রেখে ন্যাংটা মা জগদম্বার দিকে তাকিয়ে থাক্। শালা, শুয়ারকী বাচ্চে! চল শালা কালীঘাট যাব।

টানতে টানতে নিয়ে গেল, যেখানে গাড়িটা রেখেছিল সেইখানে। অনেক গাড়ির মাল-মশলা দিয়ে গাড়িটা তৈরি। নিজের কাজ জানে, নিজেই করেছে। একেবারে চাবুকের মতো। গাঢ় চকোলেট রঙ। ঝকঝকে পালিশ। ঝকঝকে হাতল। ঝকঝকে হেডলাইট। আমার পেছনে এক থাপ্পড় মেরে বললে, ওঠ। গাড়ি স্টার্ট নিল। ঠিক সুতোর মতো সূক্ষ্ম শব্দ, যেন ইঞ্জিনে তীর চলে গেল। গাড়ি চালায়ও তেমনি। যেন জলে নৌকো চলেছে। ফর্সা মুখ, গোলাপী গাল। একটা লোক এত সুন্দর হতে পারে! তারক সরকারের ইচ্ছে ছিল সুন্দর হবে। বাবা বিশ্বনাথ সরকারের কুৎসিত মনের জন্যে সুন্দর হওয়া গেল না। তা না হলে মাকে তেমন কুৎসিত দেখতে ছিল না। যাক সে সব চাওয়া-পাওয়ার কথা। গেরিলার মতো দেখতে মহাপুরুষ আছেন। উটপাখির মতো দেখতে বিলিতি সুন্দরী। তেনার এই সৃষ্টিতে সবই আছে। সেই মহাকাশনিবাসী চিরজাদুকর। ছুঁচের ভেতর দিয়ে যিনি হাতি গলাতে পারেন। চামচের ওপর পাহাড় ধরতে পারেন।

মন্দিরের এক পাশে গাড়িটাকে জুতোর মতো ফেলে দিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। সব চেনা। সবাই চেনা। কেউ বলছে, দাদা। কেউ বলছেন, কিশোরী। নমস্কার, কেমন আছেন। কিশোরীদা চলেছে মা ভবতারিণীর

দরবারে।

—তুমি বুঝি প্রায়ই আসো ?

—পাপীদের প্রায়ই আসতে হয়। জেনে রাখ, ভগবান পাপীর। পুণ্যাত্মারা পাত্তা দেয় না। তারা নিজেরাই ভগবান।

বিকেলবেলা। সবে মন্দির খুলেছে। তেমন ভিড় নেই। মায়ের পূর্ণ দর্শন হল নির্বিঘ্নে। কিশোরীদা শুয়ে পড়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এদিকে আয়। মন্দিরেব পেছনের গলিতে নিয়ে গিয়ে বললে, হাত দে এই দেয়ালে, বল, যে মাকে এত ভক্তি করে, সে কোন কুসঙ্গে পড়ে মায়ের বয়সী মেয়েদের বুক টেপার শিক্ষা পেয়েছে ? ডালিম যখন ছেলে ভেবে তোকে আদর করছিল, তখন তুই ও কুকাজ করেছিস ? বল শালা ! তা না হলে তোকে ওই হাঁড়িকাঠে বলি দেব।

—কেউ তো শেখায়নি কিশোরীদা, নিজে নিজেই শিখে গেছি।

কিশোরীদা হা হা করে হেসে উঠল, বেশ বলেছিস, ঠিক বলেছিস, এসব শেখাতে হয় না। যেমন, কথা বলা শোখাতে হয় না। যেমন, খেতে শেখাতে হয় না। বহুত আচ্ছা বলেছিস। তুই আমার গুরু। নে চল চন্নামেত্তর খাই। বাইরে এলুম। শুরু হল কিশোরীদার দু'হাতে দানধ্যান।

গাড়িতে বসে বললে—তোর বাবা তো এখানে নেই। মোগলসরাইতে বদলি করে দিয়েছে। তেড়ে ঘুস নিয়েছিল। হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। চাকরিটাই চলে যেত, তোর এই দু নম্বর মা এনকোয়ারি অফিসারের মুণ্ডু ঘুরিয়ে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান দিয়ে চাকরিটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে, এইবার চাকরিটা যাবে। কিশোরীদার গাড়ি বিদ্যুতের মতো স্টার্ট নিল—চল, কেওড়াতলাটা ঘুরে যাই।

—বাবার চাকরিটা এবার কী করে যাবে ?

—আমবা যাওয়াব। তোর মাকে দিয়ে একটা দরখাস্ত ঠুকে দোবো রেলের হেড অফিসে।

—তাহলে বাবার সংসার চলবে কী করে ?

—সে ভাবনা তোমার আমার নয়, ডালিম চালাবে।

—ওসব করে লাভ কী ? তা ছাড়া মা দরখাস্ত করবে না।

—কেন ?

—মা বাবাকে ভালবাসে।

—সে কী রে ? মেয়েরা কী জিনিস মাইরি।

শ্মশানে গিয়ে কিশোরীদা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে এদিক, ওদিক তাকাচ্ছে। চিতা জ্বলছে। একটু করে এগোয়, আবার পিছিয়ে আসে। এতই যখন ভয়, তখন আসার কী দরকার ছিল!

—ভয় করছে তো এলে কেন?

—সে তুই বুঝবি না, এখানে আসার একটা ব্যাপার আছে।

—বলোই না।

—আমার যখন কুড়ি বছর বয়েস তখন আমি পঁচিশ বছর বয়সের একটা মেয়ের প্রেমে পড়ি। তার নাম ছিল উমা। সেও আমাকে ভীষণ ভালবাসত। সেই উমা এই শ্মশানে আছে। আমি তাকে অনুভব করতে আসি। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার পাগলামি।

—তাহলে ভয় পাও কেন?

—মৃত্যুর কথা ভেবে। সেটা কী-ভাবে হবে! বাবার মতো আত্মহত্যা, না মায়ের মতো ঘাটে পড়ে! আমি রাজার মতো মরতে চাই, আর ফকিরের মতো বাঁচতে চাই। তোমাকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি—প্রেম করবি না, বিয়ে করবি না। তোর বাবা মোগলসরাইতে, আর ডালিম তোর বাপের বিছানায় এক মক্কেলকে শুইয়ে রেখেছে। কোনও দরকার নেই সংসারের। এই যে তোর বাবা আর মা প্রেম করল, আর তুই এলি, এসে কি সুখে আছিস! তোর জীবনের ল্যাঠা তো তোকেই সামলাতে হবে। কার ফুর্তির শাস্তি কে পাচ্ছে। আমি সেইজন্যে সংসার করিনি।

আমাদের কাজ শেষ। আমরা ফিরে চলেছি, রাতের কলকাতার শোভা দেখতে দেখতে। আবার সেই গন্ধ।

কিশোরীদা বললে—পাচ্ছিস? চল, গোটা দশেক কিনে, স্যালাড সমেত প্যাক করে, বাড়ি নিয়ে যাই। তুই মায়ের সঙ্গে বসে সাঁটাবি, আমার তো কেউ নেই। আমি বসব বোতলের সঙ্গে।

—সে কী গো! এই যে বললে, ছেড়ে দিলুম।

—ধ্যাস্ শালা, নেশার ঘোরে মানুষ ধরে-ছাড়ে। নেশা কেটে গেলে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়। নেশা কেটে গেছে, এখন নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কিশোরীমোহন ঘোষ, বয়েস তেত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, যা হয় হবে। পিতা, এক্স জমিনদার, মাতা সুরবালা, দুজনেই স্বর্গত। একজন ঝুললেন, আর একজন কাশীর ষাঁড়ের গুঁতোয় সোজা বৈকুণ্ঠে। একজন নরকে, আর একজন স্বর্গে। কিশোরীমোহন গাড়ির ডাক্তার। ইঞ্জিন এক্সপার্ট। সে শালা মাল খাবে

না, মেয়েছেলে করবে না, তা কখনও হয়! ট্রাক ডাইভার গঙ্গাজল খেয়ে স্টিয়ারিং ধরতে পারবে! ঘুস না খেয়ে পুলিস থাকতে পারবে! মড়া না খেয়ে শকুন পারবে! ওইসব ঝোঁকের কথা, নেশার কথা, একদম বিশ্বাস করবি না। লম্পট যখন—মা বলে সম্বোধন করে, তখন বুঝবি ল-টা উহ্য আছে। মুখে বলছে মা-মা, মনে বলছে, মাল। এই পৃথিবীর কারোকে বিশ্বাস করবি না। এমন কী নিজেকেও না। ডান হাত বাঁ হাতকে বিশ্বাস করবে না, বাঁ হাত ডান হাতকে। শোন, তুই নিজেকে সোজাসুজি কোনওদিন দেখতে পাবি না। আয়নার সামনে দাঁড়া—ডানটা বাঁ। অলওয়েজ উল্টো।

গাড়িটা রাস্তার একপাশে খিচ্ করে থামল। বাঁ দিকে বিলিতি মদের দোকান। নামতে নামতে বললে—আজ নিজেকে পুরস্কার দেব, এক বোতল, না দু' বোতল মদ। টু বটলস অফ ডেলিকেট স্কচ। কেন? অন্তত একবারের জন্যেও বলতে পেরেছি—মদ, তোমাকে ছাড়লুম। সাবধানে বোস। ফট্ করে নেমে মরনিং ওয়াকে যাসনি। কেউ ডাকলেও গাড়ি ছেড়ে নড়বি না। মনে রাখবি—এর নাম কলকাতা। আমার একটু দেরি হবে।

সামনের সিটে বসে আছি। আমার পায়ের একটু ওপরে একটা খোপ। চাপ মারতেই খুলে গেল। যন্ত্রপাতি। ছোট মতো একটা বই। হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা রিভলভার। ভয়ে তাড়াতাড়ি রেখে দিলুম। বন্ধ করে দিলুম খোপটা। পাশ দিয়ে ট্রাম যাচ্ছে, ঠ্যাং ঠ্যাং ঘণ্টা। বাস যাচ্ছে তেড়েফুঁড়ে। ফুলের মালা বিক্রি হচ্ছে। সেজেগুজে মেয়েরা চলেছে। কমলা শাড়ি, নীল শাড়ি, গোলাপী শাড়ি। দু পাশে সুখের স্রোতে টগবগে ঘোড়া। কাঁচের ঘরে বসে চিড়িয়াখানা দেখছি।

কিশোরীমোহন ঘোষ দু'হাতে দুটো বিশাল প্যাকেট নিয়ে ঘামতে ঘামতে ফিরে এল। ধরিয়ে দিল আমার হাতে।— দু মক্কেলকে একটু সাবধানে ধর। একটা আমার, আর একটা যে আজ আমার সঙ্গে রাত কাটাবে তার। বোতল দুটো টিং শব্দ করে উঠল—ঠিক বলেছ, কিশোরীমোহন। আর একটা প্যাকেট গরম আগুন, জবরদস্ত গন্ধ—চিংড়ির কাটলেট। গান গাইতে গাইতে কিশোরীদা স্টার্ট দিল—আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমার সনে।

কিশোরীদা গাড়ি চালাচ্ছে, আর বকবক করছে—সেই গল্পটা জানিস, এক ব্যাটা পাপী, আমার মতোই তার চরিত্র, নরকে যেতে গিয়ে স্বর্গে চলে গেল। শোন তাহলে, মজার গল্প। একটা লোক, আমার মতোই রোজ লাল পাড়ায় যেত। সেখানে তার একটা ডালিমের মতোই মেয়েমানুষ ছিল। লোকটার খুব

পয়সা ছিল। সারা জীবন ধরে সেই মেয়েমানুষটাকে দিতে দিতে সব ফুরিয়ে ফেলেছে। শেষ বয়সে একেবারে নিঃস্ব, ফকির। এতকাল সে যখনই গেছে একটা না একটা দামি উপহার দিয়ে গেছে। আজকে হীরের নেকলেস, কালকে সোনার নেকলেস, যা ছিল পরপর সবই দিয়ে গেছে। আমার মতোই তার কোনও সংসার নেই। একটাই তফাত, তার অনেক সম্পত্তি ছিল, অনেক টাকা। দিতে দিতে বয়স হয়েছে, বৃদ্ধ হয়েছে—কিন্তু নেশা তার কাটেনি। শেষের দিনে তার আর কোনও সম্পত্তি নেই, পড়ে আছে মাত্র একটা টাকা। তখন সে ভাবছে—যাচ্ছি তো, আজ এই একটা টাকায় আমার প্রিয়ার জন্যে কী নিয়ে যাব। এক টাকায় কী আর পাওয়া যাবে! চিন্তা করছে আর হাঁটছে। হঠাৎ দেখলে এক ফুলঅলা। গোলাপ ফুল সাজিয়ে বসে আছে এক জায়গায়। বেশ বড় গোলাপ। আর দাম বলছে—টাকায় একটা। তা বেশ তাই হোক। এত কাল তো অনেক দিয়েছি, আজ না হয় শেষ টাকায় শেষ গোলাপটা দিয়ে যাই। বৃদ্ধ চলেছে তার প্রিয় বেশ্যার ঘরে, হাতে একটা লাল গোলাপ। একটা নালা পেরোতে হয়, বেশ বড় নালা, পেরোতে হবে লাফিয়ে। এক হাতে ফুল, কোঁচাটা সামলে, বৃদ্ধ মেরেছে লাফ, কিন্তু টাল সামলাতে পারেনি। হাত থেকে ফুলটা নালায় পড়ে গেছে। যাঃ, ফুলটা তো প্রিয়াকে দেওয়া গেল না। বৃথাই নষ্ট হল। অ নষ্টই যখন হল, তখন বলি না কেন—কৃষ্ণায় নমঃ। অনেকটা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ-র মতো হল আর কী। বৃদ্ধ বললে— কৃষ্ণায় নমঃ। সেই রাতেই সে বেশ্যার ঘরে মারা গেল। যমদূতেরা নিয়ে গেল যমালয়ে। যমরাজ বলছেন, চিত্রগুপ্ত, এর পাপ-পুণ্যের হিসেবটা দেখো তো। চিত্রগুপ্ত, পাতা উল্টে উল্টে বললেন— মহারাজ এর পুণ্যটুন্য কিছু নেই, কেবল পাপ আর পাপ। সারা জীবনটা শুধু পাপ। ধর্মরাজ বললেন, হতেই পারে না, ভারতবর্ষে যে জন্মেছে, তার একটুও পুণ্য নেই, এ আমি বিশ্বাস করি না, দেখো, দেখো, ভাল করে দেখো। আবার সব গোড়া থেকে দেখো। চিত্রগুপ্ত আবার দেখছেন। হঠাৎ বললেন—মহারাজ, টেনেটুনে একটু, এক ছিটে পুণ্য বের করা যায়। সেটা হল, বেশ্যার জন্যে গোলাপ নিয়ে যাচ্ছিল, সেটা নালায় পড়ে যখন ভেসে যাচ্ছিল, তখন অগত্যা বলেছিল—কৃষ্ণায় নমঃ। যমরাজ তখন সেই পাপীকে বললেন—দেখো, এই যে তুমি কৃষ্ণায় নমঃ বলেছিলে, তাতে তোমার সামান্য পুণ্য হয়েছিল, এর জন্যে এই যমালয়ের গোলাপ বাগানে পাঁচ মিনিট খুশি মতো বেড়াতে পারবে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। পাঁচ মিনিট পরেই কিন্তু অনন্ত নরকভোগ। কোনটা

আগে ভোগ করবে। পাপী বললে, খুচরোটাই তাহলে আগে সেরে যাই। এরপর গল্পটার আরও অনেকটা আছে, সে খুব মজার। এইটুকু বললুম কেন জানিস—ওই যে একটু আগে মদ ছেড়ে দিলুম। বিলিতি হিপকেস ছুঁড়ে ফেলে দিলুম গাড়ির চাকার তলায়। পুণ্য হল। ভগবান তো আর আসবেন না। সিনেমা ছাড়া কেউ কোনওদিন ভগবান দেখেছে! তুই দেখেছিস! তাই নিজেই ভগবান হয়ে নিজেকে পুরস্কার দিলুম—দু বোতল দিশি বিলিতি মাল। কুমকুমের স্বর্গে বসে ওড়াব। অনন্ত নরকভোগ তো বরাতে নাচছেই।

—পথ তো এখনও পড়ে আছে অনেকটা, বাকি গল্পটা বলো না।

—সে বেশ বড়, আর একদিন বলব। রবিবার আসবি। কাবাব তৈরি করব।

গল্পটা শেষ করব। আজ অনেক বকেছি।

তোমার রিভলভার আছে?

—জানলি কী করে।

—এর মধ্যে রেখেছ কেন?

—খুলেছিলিস? নিজের সেফ্‌টির জন্যে রাখি। অনেক বেয়াদবকে পেটাই তো। দিনকাল ভাল নয়। কখন ঝপ করে ঝেড়ে দেবে। মৃত্যুটা আমার অপঘাতেই হবে।

গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে, কিশোরীদা বললে—যা, কাটলেটের একটা প্যাকেট বাড়ি নিয়ে যা।

—কেন? আমাকে ভিখিরি ভেবেছ না কি?

পাছায় এক লাথি। মুখ থুবড়ে ঘাসের ওপর—শালা, পাকা পাকা কথা। অশিক্ষিত, পেছন পাকা, ডেঁপো। নিজের ভাবি বলে সব কাজ ফেলে, তোর বাপের সঙ্গে লড়তে গেলুম। তুই শালা মনে ভিখিরি, তাই তোর এত ভড়ং। বল, তুই ডালিমের মাই টিপেছিলিস কেন? সে, তোর মায়ের বয়সী। কে তোকে এই শিক্ষা দিয়েছে? চল তোর মায়ের কাছে। কিশোরীমোহন ঘোষকে অপমান! তুই আমার ভায়ের মতো, এত বড় অপমান আমাকে করতে পারলি। কিশোরীদা কেঁদে ফেলল। একটা প্যাকিং বাক্স পড়েছিল। কিশোরীদা বসে পড়ল তার ওপর।

আমার খুব খারাপ লাগল। ভয়ও পেলুম। মাকে যদি বলে দেয়। তবে আমি হলুম তারক সরকার। সেই বয়স থেকেই শিখে গিয়েছিলুম, কখনও বোকা হবে, কখনও চালাক, কখনও সাধু, কখনও শয়তান। সেই গানের

মতো—কভু প্রেমানন্দের রহি যে আনন্দে, কখনও নয়নে বহে অশ্রুধারা। ধড়াস করে কিশোরীদার পায়ে পড়ে গেলুম।—হঠাৎ বলে ফেলেছি। অনেকেই আমাকে দয়া করতে আসে, বলে, তোর বাপ তো থেকেও নেই। কেউ বলে, রোজ আমাদের দুধটা এনে দিলেও তো দু'পয়সা রোজগার হয়, কেউ বলে, র্যাশানটা সপ্তায় সপ্তায় তুলে দিস না। তাই আমি বলে ফেলেছি।

কিশোরীদা আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললে—দয়া আর স্নেহ বুঝতে শেখ। প্রেম আর কাম বুঝতে শেখ।

॥ তিন ॥

রবিবাবু, মানে আমাদের হেডমাস্টার মশাই একদিন আমাকে বললেন, ছুটির পর বাড়িতে দেখা করতে। সেই একবারই গিয়েছিলুম। পরে আর যাইনি। দরকারও পড়েনি। তাঁর মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছিল ; কিন্তু আমার সময় কোথায়। ছুটির পর সাঁই সাঁই করে বাড়ি চলে আসি। সরলামাসীর প্রবল আকর্ষণে। অনেক রকম ছল-ছুতো মাসী আমাকে শিখিয়েছিল, বলেছিল, মাকে বলবি, মাসী আমাকে পড়াবে। মা বিশ্বাস করেছিলেন। সরলামাসী মায়ের চেয়ে অনেক বেশি লেখা-পড়া জানে। মাসী অনেক টাকা পেয়েছে। মেসোর অফিসের টাকা, ইনসিওরেন্সের টাকা। আমাকে বেশ নাদুস-নুদুস করেছে ; হাঁস, মুরগী খাইয়ে। নতুন একটা নেশা ধরিয়েছে সিদ্ধি। নিজেই বাটে মিহি করে। নানা রকম মশলা মেশায়। সন্ধের মুখেই আমরা দু'গেলাস মেরে দি। তারপর ক্ষীর। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অন্য চেহারা। তখন আর মাসী, বোন পো সম্পর্ক নয়। যেন দুই সমবয়সী নারী-পুরুষ। অশ্লীল, ইতর। সেই সব কাণ্ড-কারখানা পৃথিবীর কেউ কোথাও কখনও লিখবে না। লেখা যায় না। ইন্দ্রিয়চর্চার নিত্য-নতুন আবিষ্কার। সে-খেলায় নারীই প্রধান। শক্তির অধীন পুরুষ। কেন, খারাপ কী ? ছি ছি করার কোনও কারণ নেই। কালী কেন শিবের বুকে ? বিপরীত রতাতুরা। তান্ত্রিক জানে, জানে ফকির, বাউল। মদন, মাদন, শোষণ, স্তভন, সম্মোহন। তারক সরকারের অনেক উপকার করেছিলেন সেই ভয়ঙ্কর মহিলা।

রবিবাবু ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। গম্ভীর মুখ। সেই হাসিখুশি ভাব আর নেই।

—শোনো তারক, আমাদের এই স্কুলের একটা সুনাম আছে। ফাইন্যাল পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের প্রথম দশজনের মধ্যে নাম থাকে। আমি তোমাকে ফ্রি করেছিলুম, আমার আশা ছিল, তুমি ভাল হবে লেখাপড়ায়, অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। তখন তোমাকে আমি ভালবাসতুম, এখন তোমাকে আমি ঘৃণা করি। পড়াশোনায় তুমি অত্যন্ত সাধারণ মানের। তখন তোমার মধ্যে একটা সংগ্রামের ভাব ছিল, এখন তোমাকে দেখলে মনে হয়, একটা ভোগী, বখাটে ছেলে। কৈশোরেই যৌবন এসে গেছে। অনেক বছর ধরে ছেলে চরাচ্ছি, চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি, কে কেমন, বুঝতে পারি কে পবিত্র, কে অপবিত্র, অভ্যাসে, চিন্তায়। তুমি হস্তমৈথুন করো? এবারের পরীক্ষায়, তোমার উত্তর আর স্বদেশের উত্তর এক হয়ে গেছে। তুমি স্বদেশের টুকেছ—প্রুভড় বিঅন্ড ডাউন। এই স্কুলে তোমাকে আর রাখা গেল না।

চেয়ারটাকে উল্টে দিয়ে বেরিয়ে এলুম। যে মানুষ ধরে ফেলে তাদের ত্রিসীমানায় থাকতে নেই। এই শিক্ষাটা আমার সেই বয়সেই হয়ে গিয়েছিল। কিছু মানুষ যেন আয়নার মতো। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই নিজের আসল মুখটা ফুটে ওঠে। তখন ভয় করে। মনে হয়, একটা গাড়ি ফুল স্পিডে এমন একটা রাস্তায় ছুটছে, যার শেষে খাদ। পড়ব আর মরব। যে-সব মানুষ জ্ঞান দেয়, তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। পুকুরের মাছ যদি সমুদ্রের মাছকে জ্ঞান দিতে যায়, সমুদ্রের মাছ হাসবে। আরে জ্ঞানের পুকুরের বাইরে জ্ঞানের সমুদ্র আছে ম্যান। সেখানে বিশাল ঢেউ, তিমি, হাঙর। বেড়ার গাছ আর বিশাল গাছে অনেক তফাত। আমি তারক সরকার। আমার বয়েস যখন দুই, আমার বাবা বিশ্বনাথ কুড়ি বছরের এক চ্যাংলাকে নিয়ে নিজের প্রাইভেট বেশ্যালয় করেছিলেন। জ্ঞানের জোরে নয়, প্রবৃত্তির জোরে, টাকার জোরে, ঘুসের জোরে: আমি বলব চরিত্রর জোরে। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি করেছি। কারও পরোয়া করি না। তোমরা লুকিয়ে করো, আমি খোলাখুলি করি। আমি বাঘের বাচ্চা। মানুষের ঘাড়ে আমি ভগবানকে চাপাতে চাই না। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, সম্মোহন, বাস্, এই হল জীবনের রয়্যাল রোড। গোটাকতক অসুস্থ নপুংশক কী বলেছে আমার জানার দরকার নেই। নর চায় নারী, নারী চায় নর। তালা চায় চাবি, চাবি চায় তালা।

আমার আর এক গুরু দুলিচাঁদ গ্যাংস্টারকে যখন আমার জীবনের এই কাহিনী বলেছিলুম, তখন সে বলেছিল, তুমি আর তোমার বাবা যথেষ্ট প্রচার পেলে অন্য আর এক জাতের মহাপুরুষ তৈরি হতে। ধরো হরিণের ছেলে

অহিংসার গল্প পড়বে, বাঘের ছেলে পড়বে ? বাঘের ছেলে হরিণের পাঠশালায় পড়তে এলে, হরিণ পণ্ডিত ছপটি মেরে মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করবে—অহিংসা পরম ধর্ম। তাতে বাঘের ছেলে অহিংস হয়ে যাবে ? মাটন কাটলেট ছেড়ে ভেজিটেবল কাটলেট খাবে ? পনির মটর খাবে ? কুকুরের ছেলেকে যদি বলা হয় ভাদ্র মাসে অমন অসভ্যতা করিস কেন ? এই নে পড়—সংযমই সাধনা, দেখবি কুকুরেশ্বর এসে সিদ্ধাই দিয়ে যাচ্ছে, তোর ন্যাজ জ্যোতি খেলছে। লক্ষবার জপ কব। নেহাত না পারলে সদারা সহবাস কর মাঝরাতে কুকুরপ্রকোষ্ঠে। তোমাদের সরকারের এই লিফলেট পড়ো—ওয়ান কেঁউ, টু কেঁউ, নট মোর দ্যান থ্রি কেঁউ। প্ল্যান্ড ফ্যামিলি ইজ হ্যাপি ফ্যামিলি, তোমাকে তেড়ে কামড়াতে আসবে। জ্ঞানদাতা ছুটছে, পেছনে একলাখ কুকুব। আরে ম্যান যীশুকে তার চালারাই ঝুলিয়ে দিলে। বুদ্ধদেবকে দিলে বিষ।

আমি যেমন সরকার থেকে গুছাইত, দুলিচাঁদ তেমনি শা থেকে গ্যাংস্টার। অরিজিন্যালি ভাগলপুরের মাল, কলকাতার টিকি ধরে নাড়ছে। পুলিসের বড়কর্তা তার সঙ্গে অরেঞ্জ কালারের সখী নিয়ে গঙ্গায় প্রমোদ ভ্রমণ করেন। একটু একটু পান করেন, একটু একটু নাড়াচাড়া করেন। দুলিচাঁদ দুটো থ্রিস্টার হোটেল আর বিশাল এক বার-কাম-রেস্তোরাঁর মালিক। রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা আছে। দুটো অ্যাপার্টমেন্ট আকাশে ঢুঁ মারছে। তিন নম্বরে আটকেছে। কলকাতার একটা বহুতল পাশ ফিরে শুয়ে পড়ায়, সে যতটা উঠতে চেয়েছিল ততটা উঠতে পারছে না। কোই হর্যা নেহি। ওপরে না উঠতে পারি, পাতালে আবগারি আর ক্যাসিনো চালাব। সো ওয়ান ক্যান ইস্টপ মাই পোরোগরেস। সিভিলাইজেসানের ফার্স্ট বলে মহাপুরুষদের উইকেট ছিটকে যাচ্ছে—ফিরে আসছে, গাঁজা, গুলি, ভাঙ, চরস। সমাজ একেবারে চৌরস। চৌরঙ্গির এভরি থার্ড ওম্যান ইজ এ কলগার্ল।

আমি গুছাইত—দুলিচাঁদ বাঘ, আমি তার ফেউ। যা প্রসাদ-টসাদ পাই, তা কম নয়। আমাকে লাইক করে। বলে, বাঙালী হলেও, তোমার অতীতটা একেবারে বিলিতি।—তোমার কোনও দুঃখ আছে না কি ? থোড়া কুছ্ আফসোস ?—একটাই, বাপ তো ছেলেকে সুশিক্ষা দেয়, চোদ্দ বছরের ছেলেকে তার বাপ শিখিয়ে দিয়ে গেল—হাউ টু রেপ। এই আর কী ! ব্যাড এগজাম্পল। লোকে বলে।

—লোকে বলে ! বুদ্ধুরাম। আরে লোক না পোক্ ! লোক দেখবে তুমি ?

হিউম্যান বিইংস ! কাম উইথ মি ম্যান।

দুলিচাঁদ আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রথমে তার বারে। একটা কোণে আমাকে নিয়ে বসল। বেয়ারা মালিককে দেখে সসম্মানে এগিয়ে এল। আমার জন্যে স্কচের ফরমায়েস গেল। সে খাবে না। তার মদ খাওয়ার সময়টা উল্টো। যখন মহাবীরের পুজোয় বসবে, তখন পেট টইটম্বুর মালে। বলে, নিজেকে ভুলতে না পারলে, অলৌকিক, উদ্ভট জিনিসে বিশ্বাস আসে না। মহাবীর। বীরের বীর। জাস্ট লাইক অরণ্যদেব। আমার বরফভাসা স্কচ এসে গেল। শুরু হয়ে গেল কোমর দোলানো গান। দুলিচাঁদ বললে—মেয়েটাকে দ্যাখো, আর টেবিলে-টেবিলে যারা বসে আছে তাদের দ্যাখো। মেয়েটা যাচ্ছেতাই একটা হিন্দি গান গাইছে। বললুম, গানটা অশ্রাব্য। দুলি বললে—গানটা কোনও ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হল মেয়েটার শরীর। গান না গেয়ে, কুকুর ডাকলেও কিছু এসে যেত না। আবার শরীরটাই সব নয়, অনেকেরই ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আছে। কিন্তু তারা শরীর দেখাবার, সেক্স থ্রো করার আর্টটা জানে না। এখানে যারা এসেছে তারা বেশিরভাগই ইমপোটেন্ট। কোনও সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক মেয়ে এসে যদি বলে, হ্যালো মিস্টার, কাম অ্যান্ড স্যাটিসফাই মি—সবাই বলবে—ও, নো সরি ; কারণ ? কারণ একটাই তুমিও জানো, আমিও জানি। মেয়েটা ওদের দেখাচ্ছে দুটো জিনিস—ব্রেস্ট অ্যান্ড জেনিট্যাল। সিভিলাইজেসান ইজ নাথিং বাট হায়েস্ট ডিগ্রি অফ পারভারসান। অ্যান্ড দ্যাট ওয়োম্যান ইজ রিয়েল বিচ, অ্যান্ড হার ক্যাপিটাল—টু স্পঞ্জি বালজ্, থ্রি টায়ার ওয়েস্ট, মিড ডিপ্রেসান অ্যান্ড এ সাউন্ড, নো ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, রিসার্চ, ডক্টরেট। নাথিং নাথিং। অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড—দাস সেয়েভ দি হোলি বাইবল-- আউট অফ নাথিং কামস সামথিং। এইবার ওই কোণের টেবিলে দ্যাখো—সিটস এ গ্রেট পোয়েট—নোবেল ছাড়া সব পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেছে। ওই দ্যাখো, এই শহরের চারজন গ্রেট ইন্টেলেকচুয়াল। আর্ট, কালচার, সিনেমা, পলিটিকস, ড্যানস, ড্রামা, লিটারেচার, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ধর্ম, অধর্ম সম্পর্কে যাঁদের কথাই শেষ কথা। ওই দ্যাখো শেয়ার মার্কেটের কিং পিন। ওই দ্যাখো, সিটিং দেয়ার আয়রন কিং, বুলিয়ান কিং, পলিটিক্যাল লিডার। রাত বাড়বে। বাইবেল উল্টে যাবে—আউট অফ কসমস উইল কাম ক্যায়স। মেয়েটা নেমে আসবে। টেবিলে টেবিলে ঘুরবে। কেউ চাপড় মারবে পাছায়, কেউ ব্রেসিয়ারের ঝুমকোটা দুলিয়ে দেবে, কেউ লাল ঠোঁটে চুমু খেতে যাবে, কেউ বুকে নোট

গুঁজে দেবে। মেয়েটা মাছের মতো পিছলে, পিছলে যাবে। দে উইল ফাইট, আরগু, ক্রাই। সব এক একটা গার্বেজের মতো যে যার বাড়িতে চলে যাবে। প্রতিদিন এই এক দৃশ্য। দিস মেটিরিয়াল ওয়ার্লড ইজ আন্ডার দেয়ার কন্ট্রোল। দে ফ্যাশান আওয়ার লাইফ, ডিকটেট আওয়ার কালচার, শেপস আওয়ার ইকনমি।

আমরা সেই নিশাচরদের জগৎ থেকে বেরিয়ে এলুম। দুলিচাঁদ বললে—চলো আমার হোটেলে অ্যাসপারাগাসে। সেখানে দেখবে—সেক্স বাজার—ফেভার ম্যানিপুলেশন, সাইলেন্ট রেপ। রেপ ফর প্রোমশন, রেপ ফর কন্ট্রাক্ট, রেপ ফর ফিলম কেরিয়ার, অল সর্টস অফ রেপ। দিস ইজ রেপিস্টস ওয়ার্লড মাই ম্যান। মিস্টার রে, ডিরেক্টার অফ এ মালটি ন্যাশন্যাল, মিসেস সেনকে কামড়াচ্ছে। মিস্টার বাজাজ, মিস দফাদারের দফারফা করছে। কারণ দফাদার ইস্টার্ন রিজিয়ানের পি আর ও হবেন। পাবলিক রিলেশানস-এর আগে পার্সোনাল রিলেশানস। সব বেনাম। আসল নাম আসল জায়গায়। নকল নাম, নকল ঠিকানা, আসল কাম। কত কী চাই আমাদের ? কালার টিভি, ভি সি আর, বিলিতি পারফিউম, কসমেটিকস, মাইক্রো ওভেন, ফ্ল্যাট, গাড়ি, ছেলে মেয়েদের একসপেনসিভ এডুকেশান। বাংলা গান শুনেছিলুম—তোমার আছে ভাষা, আমার আছে সুর। আমার আছে মানি, তোমার আছে হানি। আমার আছে ফেভার, তোমার আছে ফিগার।

দুলিচাঁদ গ্যাংস্টার মজার মানুষ। বলে, আমি হলুম নরকের চৌকিদার। তোমার স্বর্গেও তো মদ, মেয়েমানুষের অভাব নেই সেখানে সংস্কৃত ভাষায় সেক্‌স হয়। দুলিচাঁদ আবার পড়ুয়া লোক। তন্ত্র থেকে শ্লোক আউড়ে দিলে :

আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়োর্মর্দনং তথা।
দর্শন স্পর্শনং স্পর্শনং যোনোধিকাশো লিঙ্গঘর্ষণম ॥

একদিকে হোমের আগুন, আর একদিকে কামের আগুন। বিশ্বরূপে সবই আছে। দুলি বললে, তোমার মানব জন্মের ভিতটা বেশ পাকাই হয়েছে বন্ধু। মনে মনে ভাবি, তা অবশ্য ঠিক। সেই রবিবাবু, আর চন্দ্রদাদুর শেষটা তো আমি জানি ! নকশালরা রবিবাবুর গলা কেটে নর্দমায় ভাসিয়ে দিলে। আর চন্দ্রদাদু ব্রংকাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে ঝিয়ের কোলে মাথা রেখে মারা গেলেন। স্বর্গ থেকে রথ এল না, জগদম্বা পুষ্প বৃষ্টি করলেন না। বাজার থেকে খাটিয়া আর নারকোল দড়ি এল। সম্পদের মধ্যে রইল, এক জোড়া খড়ম, একটা জপের মালা, আর একটা বই স্তবমালিকা। মিটে গেল ঝামেলা।

কিশোরীদাকে বললুম—স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—জানতুম। লেখাপড়া তোর হবে না। তুই BOOK থেকে বুকের লাইনে চলে গেছিস।

কী করব ?

—কী করবি, তাই তো! ফ্রিশিপ ছিল যখন, তখন পড়াটা চালালে কী হত ?

—হচ্ছে না, আসছে না। অঙ্কে দশ, ইতিহাসে তিরিশ। রেজাল্ট দেখে হেডমাস্টার মশাইয়ের চোখ কপালে। এদিকে ইংরেজিতে সত্তর, বাংলায় আশি।

—তার মানে তুই আর্টসের লাইনের।

—রইল না তো শূন্য হয়ে গেল। আমাদের থার্ড বয়কে টুকেছিলুম। দুটো খাতা এক। আমারটা ক্যানসেল।

—বহুত আচ্ছা। তুই পড়িস না ? সারাদিন ঘাস কাটিস!

—অনেক কাজ তো! ঠিক সময় পাই না।

—তাহলে সেই কাজই কর। রোজগার হয় তো!

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সে-কাজে খুব খেতে পাই। গায়ে ভাল জামা উঠেছে। আগে মা সরলামাসীকে খুব অভাব ভেবে জিনিসপত্তর পাঠাত। অভাব অবশ্য কোনও সময়েই তেমন ছিল না। এখন তো যথেষ্ট বড়লোক। এখন মাকেই জিনিসপত্তর পাঠায়, যতই হোক শাশুড়ী তো! আমাদের নিতাই ঘোষ রোডের অনিলবাবু, বড় ইঞ্জিনিয়ার, একটা টুকটুকে ফর্সা ছেলে পুষেছেন। সে রোজ তিনটের সময় খাটালে গিয়ে একটা গেলাস নিয়ে বসে থাকে। দুধ দোয়া হলেই, গরমাগরম ফ্যানা ফ্যানা, পাঁচপো দুধ চোঁ চোঁ করে খায়। পাড়ার লোক ইংরেজি বই পড়ে শিখেছে, অনিলবাবু হোমো। কথাটার মানে আমিও শিখেছি ডিকশেনারি দেখে। সরলামাসী আমাকেও সেইরকম পুষেছে। আমি যে জগতের মহাপুরুষ, সেজগতের বৈচিত্র্য বেশি, লোকসংখ্যা বেশি, প্রচুর আনন্দ, খানাপিনা, কেবল আলো কম। সবটাই অন্ধকার। তা ছেলেবেলায় আমাকে তিমির পণ্ডিত বলেছিলেন কূর্মাবতার। কূর্ম তো জলের তলাতেই থাকে। গায়ে শ্যাওলা। জলের নীচে থেবড়ে পড়ে আছে। কিশোরীদা বললে—ঠিক আছে, অত চিন্তার কিছু নেই। তোর পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা ওভার অ্যাকটিভ হয়ে গেছে। অনেকেরই অমন হয়। তাই তোর চেহারাটা বয়েসের তুলনায় ভোঁদকা মতো দেখায়। তাড়াতাড়ি গোঁফ

দাড়ি গজায়। বর্ষার ব্যাং হয়ে যায়।

—সেই গ্ল্যান্ডটা আছে কোথায়? নীচে?

—তোমার মাথায়। গাধা কোথাকার। ঘাড়ের পেছনে, আমার কাছে একটা বই আছে তোকে দেখিয়ে দোবো। নিজের শরীরটাকে চেনা দরকার। মটোরের ইঞ্জিন আর মানুষের ইঞ্জিন দুটোই জানতে হবে। মানুষ বহুত জটিল। সমঝা?

—তাহলে আমি এখন কী করব?

—ভ্যারেণ্ডা ভাজবে।

—সব সময় অমন কোরো না কিশোরীদা।

—তুই আমার সঙ্গে আমার গ্যারেজের কাজে লেগে যা। যদি শিখতে পারিস তোর আর অভাব থাকবে না। যদি শিখিস, আমি তোকে পাকা মিস্ত্রী করে দোবো। তবে একটা কথা, বাবুগিরি চলবে না। তেল-কালি মাখতে হবে। চব্বিশটা ঘণ্টা খাটতে হবে। আগে ভেবে নাও।

—ভাবাভাবি নেই। আজই।

—তবে চল। আমি একটা পুরনো গাড়ি কিনতে যাচ্ছি। এনে ভোল পালটে, ডবল দামে ঝাড়ব।

খটখটে এক ভদ্রলোকের টাইট একটা বাড়ি। এ-পাশে, ও-পাশে, সে-পাশে, চারপাশে কোল্যাপসেবল গেট। চকোলেট রঙের বাড়ি। ইটের খাঁজে খাঁজে, হালকা সাদা রুল টানা। জানলায়, জানলায় নেটের পর্দা। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। সেই সাহেব আমলের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসেরই একটা জবরদস্ত বাংলো, টালি দেওয়া বারান্দা। অ্যালুমিনিয়াম রং করা ওভারহেড ট্যাঙ্ক। আইভিলতা। জেসমিন ট্রেলিম। নেমপ্লেটে লেখা—পি সি চ্যাটার্জি। এক্স চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাবকক অ্যান্ড সাইমন।

কার্পেট বিছানো ঘর। তেমনি সাজানো। জুতো! জুতো পরে! জুতো খুলে? এগোই-পেছোই।

কিশোরীদা বললে, হর্নস অফ ডাইলেমার মতো, এই হল মধ্যবিত্তের ডাইলেমা। জুতোসুদ্ধু ট্যাকট্যাক করে চল। সোজা সোফায়। পায়ের ওপর পা। তুই কিনতে এসেছিস, সব সময় ডাঁটে থাকবি।

ভদ্রলোক এলেন। এতখানি একজোড়া পাকা গোঁফ। মাথায় কিন্তু টাক। মুখে একটা পাইপ। তিনি এলেন, তাঁর বউ এলেন, লোমঅলা কুকুর এল, তবলার মতো দেখতে নাতি এল, ঝুলঝাড়ুর মতো দেখতে ছেলে এল।

কিশোরীদা ফিসফিস করে বললে—আর কেউ নেই। নেচে নেচে আয় মা শ্যামা। সব চলে আয়, হাতা, খুন্তি, ডেও ডেকচি।

ভদ্রমহিলা শুরু করলেন—গাড়িটা আমাদের ঠিক বিক্রি করার ইচ্ছে ছিল না। আমার বড় মেয়ের শ্বশুড়বাড়ি আমেরিকায়, আমার মেজ মেয়ের ইংল্যান্ডে, ছোট মেয়ের আফ্রিকায়। আর আমার বাবা আছেন ভিয়েনায়, আমার কাকা আছেন কানাডায়, আমার বড় ভাই কুয়ালালামপুরে, আমার মেজভাই গ্লাসগোতে, কেবল এদের বংশের কেউ কখনও বিলেত যায়নি। শ্বশুড় বাড়ির পরিচয় দিতে আমার লজ্জা করে। আমাদের ফ্যামেলিতে কেউ বাংলা বলে না, কেবল এদের জন্যে আমাকে বাংলা বলতে হয়। আমরা আসলে সায়েবের জাত।

কিশোরীদা বললে—আমরাও তাই। আমার জন্ম তো আকাশে।

—আকাশে মানে ?

—সে এক কেলেঙ্কারি। আমার বাবা তো পাইলট ছিলেন। মাকে বললেন, টলস্টয় বলেছেন, আকাশে গর্ভযন্ত্রণা একেবারে টের পাওয়া যায় না। তুমি শুধু আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে বোলো। আমার মা ঘড়িতে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলেন। মাকে অ্যাটেন্ড করছিলেন মিস ম্যাগনোলিয়া আর গাইনি ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ডক্টর ব্রুহাম। অ্যালার্ম বাজা মাত্রই সব হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন টি-এ-ওয়ান নাইন নাইন ফ্লাইটে। টি এ মানে ট্রানস অ্যাটলান্টিক। প্লেন যখন আর্জেন্টিনার আকাশে, তখন আমি মায়ের পেট থেকে, মালাইয়ের খোল থেকে যেভাবে কুল্‌ফিমালাই বেরোয়, সেই ভাবে স্মুথলি মিস ম্যাগনোলিয়ার কোলে। সেই কারণেই আমার ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশন্যালিটি। আমার বিশ্ব নাগরিকত্ব। কোথাও যেতে আমার কোনও পাশপোর্ট, ভিসা লাগে না।

ভদ্রলোক কোনও কথা বলছেন না। পাইপ চিবোচ্ছেন। রাগী রাগী কাঠের খড়মের মতো মুখ।

ভদ্রমহিলা বললেন, আমার ছেলেটাকে টেক্‌সাসে পাঠাচ্ছি।

—কোন ছেলে ?

—ওই তো আমার এক ছেলে। ছেলের নাম আমি চীন থেকে আনিয়েছি। ডিনসুস।

—চীন থেকে এক মাত্র কালি আসে, চাইনিজ ইঙ্ক।

—সে আসে আসুক। যখন আমার ছেলে হচ্ছে, বাবা তখন চীনে।

গবেষণার কাজে ব্যস্ত। চাইনিজ ওয়ালে কত ইট লেগেছে। সে কাজটা অবশ্য শেষ হয়নি।

—ওটা আমি শেষ করে এসেছি। আকাশে যত তারা আছে তত ইট আছে। চীন সরকার খুশি হয়ে আমাকে ডক্টরেট অফ ওপিয়াম করেছেন। আপনার ছেলে খুব লম্বা। নাম রাখা উচিত ছিল ওয়ালনাট।

—ও আমার ছেলে হবে কেন? আমার ভাই হর্যক্ষ, মানে সিংহ। আমাদের ফ্যামিলি হল লম্বার ফ্যামিলি। আমার ঠাকুর্দা নামকরা ডাক্তার ছিলেন। লোকে বলত ডক্টর টল। টেলার টুলে উঠে কোটের মাপ নিত।

—আপনার ছেলে তো খুব ছোট, তাকে এখনই ওই মারাত্মক জায়গায় পাঠাবেন?

—ছোট কোথায়! ওর বয়েস হল পঁচিশ। ও খাটের মতো পাশের দিকে বেড়েছে। এইটাই তো একটা অসাধারণ ব্যাপার। সায়েবদের কাণ্ড। ওরা কিভাবে জেনে ফেলেছে। ডালাসে ওকে নিয়ে এখন রিসার্চ হবে। ও সামনের মাসেই যাবে।

ফিরবে তো?

—তার মানে?

—রিসার্চ মানেই তো কাটা-ছেঁড়া। অপারেশন।

—তাই না কি?

—জানেন না আপনি, গিনিপিগ নিয়ে ডাক্তাররা কি করে?

—হ্যাঁ তাই তো! ডিম শুনলে? তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ভাল করে খবর নাও।

বাজখাঁই গলায় ডিমের কুসুম বলে—মাম্মি! যাবই আমি যাবই। বিনা পয়সায় আমাকে যমালয়ে যেতে বললেও যাব। টাইড অ্যান্ড টাইম উয়েট ফর নান।

কিশোরীদা বললেও কোটেশানটা এখানে যাবে না। বলতে হবে—চান্‌স নেভার কামস টোয়াইস।

ভদ্রলোক ছড়ির মতো উঠে দাঁড়ালেন। মহিলা বললেন—কি পেট ব্যথা! তখনই বলেছিলুম, ইলিশ তোমার সহ্য হয় না। অত খেয়ো না।

—আমি আর খেলুম কই। সিংহভাগ তো তোমার সিংহই খেয়ে ফেললে। আমি উঠে যাচ্ছি ডিসগাস্টেড হয়ে। আমার সময়ের দাম আছে কাবলি। বিলেতের ল্যানসেট পত্রিকার আটিকালটা আজই আমাকে শেষ

করতে হবে। রোজ রাত আড়াইটের সময় ডক্টর ডেভিড আমাকে ফোন করছেন।

—হ্যাঁ গো, তোমার সেই লেখাটা অ্যাটলান্টিকে পাঠিয়ে দিয়েছ। কি সুন্দর।

—কোনটা ?

—জাম্পিং জ্যাকফ্রুট।

—জাম্পিং নয় থাম্পিং। জ্যাকফ্রুট নয় জাগুয়ার। কেন, ওই লেখাটার কথা বলো, যেটা আমি ব্যাসাচ্যুসেটস টাইমসে পাঠালুম—ড্রিপিং ডিগবয়।

এইবার কিশোরীদা উঠে দাঁড়াল—আর তো সময় দেওয়া গেল না। আমার যে গভার্নারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ভদ্রলোক বললেন—দ্যাটস গুড ; কারণ গাড়িটা আজ দেখানো যাবে না। তবে একটা ছবি দেখাতে পারি হোয়েন আই পারচেজড নিউ। আসলে হয়েছে কী হর্যক্ষ কাল একটা অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলেছে। লাইসেন্স-মাইসেন্স অ্যান্ড কার পুলিস আটকে রেখেছে। ডিসিকে ফোন করেছিলুম। নাম শুনেই লাফিয়ে উঠেছে। অ্যাপলজি, অ্যাপলজি অ্যান্ড অ্যাপলজি। বললে, ইয়োর কার। আমি বেয়ারা দিয়ে কালই পাঠাচ্ছি।

—কী পাঠাচ্ছেন ? ওয়ারেন্ট।

—না না, দ্যাট কার।

—বায়োলজি কেমন আছে ?

—মানে ?

—মানে গাড়িটার অবস্থা কী ?

—ও তো বলছে, চেনা যায়। সামনেটা নেই, পেছনটা আছে। আপনি হাফ দাম দেবেন।

রাস্তায় নেমে কিশোরীদা বললেন—এদের কি বলে জানিস, শ্যাওলাধরা বড়লোক, শ্যাওলাধরা বাথরুমের মতো। বাথরুমটা খুব কায়দায় করা হয়েছিল, সেরামিক টাইলস, বেসিন, কমোড, শাওয়ার, ঝকঝকে ফিটিংস, সব শ্যাওলা ধরে গেছে। পেচ্ছাপ করে জল ঢালে না দুর্গন্ধ। এদের সঙ্গে মিশলে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়। বড়লোক ছোটলোক হওয়ার চেয়ে, ছোটলোক বড়লোক হওয়া ঢের ভাল।

—তুমি যা দিলে, ওরা বুঝতে পেরেছে।

—পারবে না। রতনে রতন চেনে, ভাল্লুকে চেনে শাঁকালু। এরা লোক

ডেকে এনে বড় বড় কথা শোনায়। নিজেদের গল্প, যার ষোলো আনাই অসত্য। চল, আগে আমরা এক কাপ করে চা খাই। আজ আর মা দেখাবি না শালা। চাকরি খেয়ে দোবো। চাকরির নিয়ম কী বলত? বল ডানস দেখিছিস?

—মানে বল নাচানো!

—তোমার মাথা। জোড়া গির্জার মতো, জোড়া নাচ। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। এ ওর কোমর ধরবে, ও এর কোমর, হাতে হাত, ঝিমকুড়ি, ঝিমকুড়ি বিলিতি বাজনা। এ যেভাবে পা ফেলছে ওকেও সেই ভাবে পা ফেলতে হবে। একবার এদিক যায়, একবার ওদিক। প্রভুর তালে তাল মিলিয়ে পা ফেলার নাম চাকরি। গানটা কী বলত—সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী প্রভু তুমি। যেমন নাচাও তেমনি নাচি, যেমন নাচ তেমনি নাচি ॥ প্রভু যদি মদ ভেবে অ্যাসিড খায় তোমাকেও তাই খেতে হবে, তবে প্রভু যাবেন দামি নার্সিংহোমে, তুমি যাবে হাসপাতালে। প্রভু আর ভৃত্য দু'জনেই রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেল। দু'জনে একই সঙ্গে যমালয়ে। যমরাজ বলছেন—বোসো। আগের পার্টির পেমেন্ট, মানে, পাপপুণ্যের পাওনা মিটে যাবার পর চিত্র তোমাদের ডাকবে। প্রভু চেয়ারে বসেছে, ভৃত্য খাড়া। যমরাজ বলছেন, কি হোলো? কানে খাটো না কি? আলো আটকে দাঁড়িয়ে আছ, বসতে বলেছি না: ভৃত্য বলছে, আজ্ঞে! শুনেছি, তবে সারাটা জীবন যাঁর কথায় ওঠ-বোস করেছি, তিনি না বললে বসি কেমন করে। যমরাজা বলছেন—জানো, আমি যম! ভৃত্য বলছে—মানছি, তবে মরে যাবার পর কে যম, কে ঈশ্বর, আমার জেনে কী হবে! মরেই তো গেছি। যতদিন বেঁচেছিলুম, ততদিন উনিই আমার যম ছিলেন। ওঁর চুমকুড়িতেই আমার আলো, আমার ফোয়াররা, আমার হররা। বউ নিয়ে বিদেশ গেছি, ছেলেকে ইংলিশ স্কুলে পড়িয়েছি, বিলাইতি উড়িয়েছি, মানুষকে দাবড়েছি। উনি তো আমাকে বসতে বলেননি। যমরাজা বলছেন—বসতে বলো। প্রভু বলছে—বসতে বলব। ওর চাকরি খাব! ওর কথা শুনেই আজ আমার এই চিঁড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা। ও বললে, ক্রশ, যেই রাস্তা পার হতে গেলুম ট্রাকের তলায়। যমরাজ বলছেন—তুমি বলেছিলে? ভৃত্য বলছে—প্রভুর কথায় হ্যাঁ, না বললে প্রোমোশান আটকে যায়। যমরাজ বলছেন—তুমি না বললে কী হবে, আমার খাতা থেকে তো এখুনি জেনে যাব। —সে আপনি জানুন গে। আমি কোনও প্রতিবাদ করব না। প্রতিবাদ করে, বিশ্বনাথ, রমাকান্ত, সূর্য, স্বয়ম্ভু,

এদের যা অবস্থা হয়েছে জানি। চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে বললেন—দেখা যাচ্ছে, ও যাকে প্রভু বলছে, সেই বলেছিল, ক্রশ। যমরাজ ভৃত্যকে বলছেন, তুমি সত্য স্বীকার করলে না কেন? ভৃত্য বলছে— প্রভু! মরার পর আর সত্য-মিথ্যে করে লাভ কী! দু'জনেই তো মরেছি। যমরাজ বলছেন—সেই জ্ঞানই যখন হয়েছে, তখন প্রতিবাদ করছ না কেন? —প্রভু! মরলে কী হবে! আমার যে ভৃত্যের আত্মা। পৃথিবীতে দেখেছি—প্রতিবাদ করলেই মানুষের জীবন্মৃত অবস্থা হয়। তাই ভয়ে আমি ভৃত্য। আমি ভৃত্য আমার পরিবার-পরিজন ভৃত্য, আমার আত্মা ভৃত্য। যমরাজ বলছেন—প্রভু, হল না কেন? —আজ্ঞে ক্যাপিট্যালের অভাব। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে বললেন—যাও! এদের ওঠ-বোস ঘরে পুরে দাও। দুজনেই ওঠবোস করুক তেত্রিশ কোটি বছর।

কলকাতার সবচেয়ে প্রাচীন চায়ের দোকান। কড়া টোস্ট, ডবল ওমলেট, পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কার কুঁচি ঢোকানো, ডবল হাফ চা। মুখের তার ফিরে গেল। গরিবদের সুবিধে, সামান্য জিনিসই অসামান্য লাগে। অবশ্য সরলা মাসী এখন আমাকে খুব খাওয়ায়। সেটা কোনও স্নেহ ভালবাসা নয়। ছোলা খাওয়ায় ছাগলকে, শুয়োরকে খাওয়ায়, মুরগীকে খাওয়ায়, গরুকে খাওয়ায়, সব স্বার্থে, একটা কিছু পাওয়ার জন্যে। সরলামাসী নধর একটা ছেলে চায়, তার ব্যামোর চিকিৎসার জন্যে। সে-সব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কিশোরীদাকে বললে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে!

কিশোরীদা টোস্টে কড়কড় কামড় মারছে আর বলছে—জীবনটা বেশ কাটাচ্ছি, কী বল? কোনওদিন খাওয়া জোটে, কোনওদিন জোটে না, চেহারাটা টসকায়নি। জানিস তো, কলেজে পড়ার সময় নিজেকে বিবেকানন্দ ভাবতুম। বড় বড় চোখ, বিশাল ছাতি, বড় বড় চুল, চৌকো চোয়াল। ভাবতুম শিকাগোয় যদি আর একটা বিশ্ব ধর্মসভা হয়, তাহলে গিয়ে হাজির হব, স্বামীজীর বক্তৃতাটাই আর একবার ঝাড়া মুখস্থ বলে আসব। হই-হই পড়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ব্রত কি জানিস? ব্রহ্মচর্য। যেই মীনাকুমারী মাথায় ঢুকল, স্বামীজী বেরিয়ে গেলেন। দর্জিপাড়া দিয়ে হাঁটছি দুপুরবেলা। এই পুজোর আগেটাতে হবে। তখনও ছাত্র। কলেজের মাইনে বাকি পড়ে গেছে। পরীক্ষায় বসতে দেবে না। মা একটা সোনার বালা দিয়ে বলেছে—সাবধানে নিয়ে যা, দরদস্তুর করে বেচে দে। টাকাটা সাবধানে পেটকাপড়ে করে আনবি। একগাদা টাকা পেটের কাছে, পাশ বালিসের খোলে ভরে বেঁধেছি। হঠাৎ দেখি উল্টো দিক থেকে একটা মেয়ে আসছে অবিকল

মীনাকুমারী। সোনালি পাড় বসানো সাদা সিল্কের শাড়ি, ফুরফুরে চুলে এলো খোঁপা। কানে দুটো বড় সাইজের দুল। গোল কবজিতে সোনার ঘড়ি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিচিক করে চোখ মেরে গেল। আমার ব্রহ্মান্ড ঘুরে গেল। মেয়েটা হাতদশেক গেছে, আমি অমনি ঘুরে গেলুম। ফলো করছি। কী অসাধারণ হিপ, পায়ের গোছ। আমি যেন একটা ছাগল, অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা বাঁদিকের গলিতে ঢুকল। চমকে উঠলুম, লালপাড়া। দরজায় দরজায় সেই সব। একেবারে ভিন্ন জগৎ। এখন আর ফিরতে পারছি না। নেশা লেগে গেছে। শরীর কেমন করছে। ভাবছি সঙ্গে এত টাকা। আবার প্রশ্ন ভাবছি, যথেষ্ট টাকার জোর আছে, লড়ে যেতে ক্ষতি কী! প্রেমে-কামে-কবিতায় একেবারে আচারের মতো অবস্থা আমার। একেবারে চপ চপ করছি। মেয়েটা আর একটা গলিতে ঢুকল। এটা আর একটু সরু। মেয়েটা জানে আমি পেছনেই আসছি। কোমরের বদমাইশি শুরু করেছে। হঠাৎ দোতলা একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তিন হাত তফাতে আমি থেমে পড়েছি। উঃ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবার সে কী ভঙ্গি! ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি—আসবে। বিশ্বাস কর, একদম ভেড়া। ভেড়ার মতো মেয়েটার সঙ্গে সোজা উঠে গেলুম দোতলায়। গলায় সরু একটা সোনার চেন চিকচিক করছে। একটা ঘরের সামনে এসে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলল। সুন্দর সাজানো একটা ঘর। বিশাল একটা খাট। খাটের ওপর কমসে কম গোটা দশেক বালিশ। সিল্কের মতো বেড কভার বিছানো। বিরাট একটা আয়না খাটের মাথায়। দেয়ালে দেব-দেবীর ছবি! ঘরটা নির্জন, ঠাণ্ডা, আলো আঁধারী। মেয়েটি পাখা চালিয়ে খাটে এলিয়ে বসে বললে—কী হচ্ছিল শুনি? দিনদুপুরে মেয়ের পিছু নেওয়া। এইবার পুলিস ডাকি? তুই জানিস তারক, আমার ভয়-ডর চিরকালই কম। বললুম—আমার কাকা পুলিসের বড় অফিসার। আমাকে ধরাতে হলে মিলিটারি ডাকতে হবে। মেয়েটা সামনে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—কাছে এসো। কাছে যেতেই দুটো হাত, দুটো পা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর। তারক, স্বামীজীর বদলে গিরিশ হয়ে গেলুম। মাইনাস হিজ প্রতিভা, মাইনাস শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝলি কথামৃত পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। শ্রীরামকৃষ্ণ এক জায়গায় বলছেন—নারী জগন্মাতার ভুবনমোহিনী মায়া। কাছাকাছি গেছো কী মরেছ। শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শেষ হল। হাজার হাজার নরনারী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। সুন্দরী মেয়েরা দলে দলে বেঞ্চি টপকে ছুটে আসছে, স্বামীজীকে

স্পর্শ করবে, কথা বলবে। স্বামীজী তখন মনে মনে বলছেন, দেখো বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখতে পারো তো তুমি সত্যিই ভগবান। স্বামীজী ভগবান ছিলেন। আমরা ফাঁদে পড়ার জন্যেই পৃথিবীতে আসি। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন একটা সুন্দর গল্প বলছিলেন—হিরণ্যক্ষ বধ করবার জন্যে বরাহ অবতার হলেন। হিরণ্যক্ষ বধ হল, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হয়েই আছেন। কিছু ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে বেশ আনন্দেই আছেন। দেবতাদের মহা ভাবনা, ঠাকুর যে আসতে চাইছেন না। সবাই গেলেন শিবের কাছে, একটা তো কিছু করতে হয়। মহাদেব গেলেন দেখতে। অনেক জেদাজেদি করলেন। বরাহ পাত্তাই দিলেন না। ছানা-পোনাদের মাই দিচ্ছেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙে দিলেন। নারায়ণ হি হি করে হেসে স্বধামে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে।

কিশোরীদা চা খাচ্ছে আর গল্প বলছে। নিজের জীবনের গল্প। লেখা-পড়াও যথেষ্ট করেছে। কখন করে তা জানি না। সারাদিনই তো খাটে গাধার মতো। তারক সরকার জীবনে একটা লোককেই ভালবেসেছিল, তার নাম কিশোরী। লোকটা সোনার মতো খাঁটি ছিল। গোল্ড প্লেটেড নয়। চোদ্দ নয় চব্বিশ ক্যারেট। কিশোরীদার প্রেম। ওই মেয়েটির নামই ছিল উমা। উমা প্রথম দেখাতেই কিশোরীদার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। দুপুর গড়িয়ে রাত, রাত গড়িয়ে ভোর। একটা টাকাও নেয়নি উমা। উল্টে চর্বচুষ্য খাইয়েছিল। সেই উমা মারা গেল ভাইরাস ফিভারে। উপায় থাকলে কিশোরীদা ভগবানের কাছে যেত। তিনটে বছর গুম মেরে বসে রইল। মা ছেলেকে ভুল বুঝে হলেন কাশীবাসী। সেইখানেই মৃত্যু।

দোকানেব বাইরে এসে কিশোরীদার অন্য চেহারা। আবার আগের মতো।

—চল, এইবার এক মহিলাকে দেখবি। অনেক টাকা পাওনা। তিন বছর ঘোরাচ্ছে। রাস্তাটার নাম গর্চা রোড। মহিলা কয়েকটা ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। একটা হিট করেছিল। বাকি সব কটা ফ্লপ। ফ্ল্যাটের দরজা তিনি নিজেই খুললেন। এমন সাজপোশাক, যেন এখনি কোথাও বেরোবেন! ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। মুখ মোম চকচক, আঁকা ভুরু। মাকড়সার জালের মতো পাতলা শাড়ি। ব্লাউজের সামনেটা অস্বস্তিকর নিচু। সেন্টের গন্ধ গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে পড়ে থাকা এক ঝুড়ি জুঁই ফুলের গন্ধের মতো। মহিলা কিশোরীদার গায়ে এলিয়ে পড়ে যেতে যেতে বললেন—আপনিই! কী অদ্ভুত!

কদিন কেবল আপনার কথাই ভাবছি, আর আপনি সশরীরে আমার সামনে ! ভাবা যায় ! আসুন আসুন, ভেরে আসুন। কিশোরীদা ঢুকে গেলেন। মহিলা আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে মিষ্টি করে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন—এসো ভাই, এসো। ভারী মিষ্টি ছেলেটি। এ আপনার কে হয় কিশোরী ?

—ভাই

খুব সাজানো-গোছানো বসার ঘর। সরকার থেকে গুছাইত হওয়ার পর জেনেছি—সাজগোজটাই সব। ধাপ্পা যাদের মূলধন তাদের সাজগোজটাই আসল। কিশোরীদা বলত—কিছু চাপা দিতে হলেই সাজতে হবে। একমাত্র শয়তান আর ভগবানের সাজের প্রয়োজন হয় না। তারা আসল। দেবদেবীর মূর্তি আছে, ভগবান আর শয়তানের কোনও মূর্তি নেই। মানুষের মনে ভাব হয়ে বসে আছেন।

আমরা বসলুম। মহিলা আমাদের উল্টো দিকে বসলেন। বাঁ পায়ের ওপব ডান পা-টা তুলে দিলেন একটু উঁচু করে, যাতে শাড়ির তলার দিকটা বেশ খেলতে পারে। নরম নরম সোফা। মহিলার বাঁ হাতটা সোফার পেছনে লম্বা হয়ে আছে। বেশ দীর্ঘ, ঢলঢলে শরীর। অনেকটা সরলামাসীর মতো। একটা পিপড়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভ্রমণ করতে বেশ সময় লাগবে। কিশোরীদা উপভোগ করছে।

—কী খাবেন ? হুইস্কি, বিয়ার, জিন, রাম ?

—আজ একেবারে একলা ?

—বোধহয় আপনি আসবেন বলে। আমার একটা ব্যাপার হচ্ছে আজকাল। যা ভাবছি, তাই হচ্ছে। কাল ভাবছি, সতুর ছবিটা যদি খুলে পড়ে যায় ! মনে হওয়া মাত্রই হাওয়া নেই কিছু নেই, ছবিটা খুলে পড়ে গেল। যার সঙ্গে সেপারেশন হয়ে গেছে তার ছবি কেন থাকবে ! লাউটস। সে তো এখন কৌশিকের বউকে নিয়ে আছে—এ পারফেক্ট বিচ্। বলুন কী দোবো ?

—কৌশিকবাবুর বউ তো আপনারই বোন। ড্যানসার।

—হাঁ ড্যানসার। লোকের বুকে উঠে নাচে। বোন ? বোন এখন সতীন। সতু একটা ডান্স। আমার মনে হয় না ওখানে ও আমার চেয়ে বাড়তি কিছু পাবে ! স্টিল আই অ্যাম ইয়াং। ফাইভ ফিট নাইন ইঞ্চেস। আমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস আর ম্যারিলিন মনরোর স্ট্যাটিসটিকস সেম। হিন্দি ছবি অফার দিয়েছিল। চেয়েছিল, আমার শরীর দেখিয়ে ব্যবসা করবে। বেডরুম সিন,

বেদিং সিন, রেপ। আমি রাজি হইনি। আই বিলিভ ইন অভিনয়। বাংলা ছবিতে অভিনয় ছিল। প্রবলেম হল, আমার হাইট। এমন নায়ক নেই, যে আমার অ্যাগেনস্টে অভিনয় করতে পারে। সব বেঁটে বেঁটে। সতু আমার পড়তি বাজার দেখে কেটেছে। কেতকী এখন কোমর দুলিয়ে, পাছা দুলিয়ে খুব ইনকাম করছে। ওর নীচের দিকটা বেশ ভারী। আর দেশটা লম্পটে ভরে গেছে। লাখ লাখ পারভার্ট। আমার অসুবিধে হল, আমি আনকালচারড, ভালগার লোকদের সেক্সে সুরসুড়ি দিতে পারব না। সেক্স ফর মানি, দ্যাটস্ প্রসটিটিউসান। সেক্স ফর লাভ, আমি রাজি। আপনি বলুন, রাইট নাও, উইথ ইউ আই ক্যান গো টু বেড। কিশোরী, আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। বলা যায়, আই লাভ ইউ।

—আমারও মনে হয়, আপনার ওপর একটা দুর্বলতা আসছে। আপনি ভাবছেন টাকার তাগাদায় এসেছি, তা নয়, এসেছি আপনার আকর্ষণে। অসাধারণ হলিউড ফিগার।

—ব্যঙ্গ নয় তো! প্লিজ মিথ্যেকে সত্যির মতো করে বলবেন না। আমি খুব অসহায়। একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, বোথ স্পিরিচ্যুয়াল অ্যান্ড ইক্‌নমিক।

—আমাকে ভালবাসেন কেন?

—ফর ইওর মাইন্ড, ফর ইওর ব্যবহার, স্ট্রাগল, ভদ্রতা, আদর্শ, সংবেদনশীলতা।

—তাহলে কেমন করে ভাবলেন, আমি ব্যঙ্গ করছি?

মহিলার চোখে চিকচিকে জল। ভাগ্য কাঁদালে জ্ঞানী-গুনী-বড়লোক-ছোটলোক সকলকেই কাঁদতে হবে।

—আমি খুব একা হয়ে গেছি কিশোরী। গ্যারেজে পড়ে থাকা আমার গাড়িটার মতো। রোজ সকালে একবার করে যখন ইঞ্জিনটাকে চালু করতে যাই, তখন শব্দ আমার সঙ্গে কথা বলে। সেই ঝলমলে দিনের কথা। নির্জন গ্যারেজ। অন্ধকার, অন্ধকার। ইঞ্জিন স্টার্ট করে ক্লাচে পা রেখে বসে আছি। গাড়ি যেন পেছনে ছুটছে। রাস্তা পিচের নয়, কালের রাস্তা, টাইম। সাফল্যের দিন, খ্যাতি, প্রতিপত্তির দিন, আনন্দের উৎসবের রাত। প্রথম ছবি, প্রিমিয়ার, হিট, অ্যাওয়ার্ড, পার্টি, কনট্রাক্ট, স্টুডিও, মেকআপ, আউটডোর, সতুর সঙ্গে প্রেম। বিয়ে। হনিমুন। টায়ার ফাটার শব্দ। সামহোয়্যার সামওয়ান বেসুরে গেয়ে উঠল -বি ইন দি বনেট। মেয়েটা উচিত প্রণামী না দিয়ে টপে উঠে

যাবে ? শিক্ষিতা তো হয়েছে কী। অন্ধকারে বিছানায় শিক্ষিতা অশিক্ষিতায় নো ডিফারেন্স। বডি দ্যাট মেটার্স। নট ইভ্‌ন কেস। দুটো বুক, পাছা, গলা, পা অ্যান্ড ফাইন্যালি দ্যাট ইটারন্যাল ট্র্যাঙ্গল। নো শেলি, নো কীটস, নো শেকসপীয়ার, নো বায়রন। ওন্‌লি গ্রোনিং অ্যান্ড ড্রোনিং অ্যান্ড ড্রেনিং দি ভালগার লাস্ট। মোস্ট পাওয়ারফুল ডিস্ট্রিবিউটারের নজর লাগল। একের পর এক প্রস্তাব, তোমাকে আমি এক নম্বর হিরোয়িন বানিয়ে দোবো যদি আমার রক্ষিতা হও। আমার তিন তারা হোটেলের একটা সুইট তোমার, তোমার জন্যে একটা আলাদা ইম্পালা গাড়ি, আর টাকা! সে তুমি যত চাইবে। পা থেকে মাথা জ্বলে গেল। বাবা অক্সফোর্ডের এম এ। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু। আমার মা শান্তিনিকেতনের, আমি একটা পেটমোটা ব্যবসাদার কালোয়ারের রক্ষিতা হব। তখন এল ছোট ছোট অফার, ঠিক আছে, আমার সঙ্গে বিদেশে চলো। তাও না ? তাহলে হোটেলে একটা ঘর থাকবে, সপ্তাহে একটা দুটো রাত দু'জনে একসঙ্গে লাইফ এনজয় করব। তাও না। তাহলে দ্যাখো আমি তোমার কী করতে পারি। সেকেন্ড বইটা হিট। দারুণ চলছে। সার্কিট থেকে তুলে নিল। বললে, মিনিমাম সেল নেই। 'বেশ' পাচ্ছে না। থার্ড বই এক চক্রান্তে। ডিরেক্টররা বললেন, সিনেমায় অত চরিত্র দেখালে সাকসেস আসে না। আমার চাই না সাকসেস ; কিন্তু আমি যে সিনেমা করতে ভালবাসি। স্টুডিওর প্রেমে পড়ে গেছি। টাকার কাছে আমার প্রতিভা পরাজিত।

কিশোরীদা গুম মেরে বসে রইল কিছুক্ষণ। ভীষণ নরম মানুষ। চোখে জল এল বলে। কিশোরীদা বললে—আমি হাজার তিনেক টাকা পেতুম। এখন আর পাই না। ওটা নিয়ে অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। আর বলে যাই, কেউ না থাক, আমি আপনার পাশে আছি। অবশ্য আপনি যদি পাশে থাকতে দেন তবেই।

অমন সুসজ্জিত এক মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কিছু একটা বলতে চাইছেন, বলতে পারছেন না। কিশোরীদা উঠে পড়ল, মহিলার সামনে এসে বললে, আজ আমি যাচ্ছি। আবার আসব। প্রয়োজন হলে ফোন করবেন। নম্বর দেওয়া আছে আপনার কাছে। গাড়ির কোনও প্রবলেম আছে ?

মহিলা দু'হাতে কিশোরীদার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। বসে পড়তে হল কিশোরীদাকে মহিলার পাশে। আমি প্রায় ছিটকে চলে গেলুম ঘরের বাইরে। একেবারে রাস্তায়। কিশোরীদা কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে গেল। চোখ মুখের

চেহারা বদলে গেছে। কোনও কথা না বলে আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগল হন হন করে।

অনেকটা হাঁটার পর কিশোরীদা বললে, যাক, এতদিনে নৌকো একটা ঘাট পেল বুঝলি ? মানুষের সব স্বপ্নই কি স্বপ্ন থেকে যায় ! একটা দুটো পূর্ণ হবেই, তা না হলে ভগবানকে মানুষ মানবে কেন ? ধর, আমি গ্যারেজটা দেখব আর ও দেখবে আদার সাইড। জনসংযোগ। লেখাপড়া জানা কালচারড মেয়ে। গ্যারেজটা আরও বড় হবে। কতলোক চাকরি পাবে। সেটাও তো একটা সারভিস টু দি নেশান।

—তুমি ওই ভদ্রমহিলাকে চাকরি দিলে ?

—না রে, আমি ওই ভদ্রমহিলার চাকরি নিলুম। পোস্টটা হল স্বামী।

—তুমি বিয়ে করবে ?

—তোর আপত্তি আছে ?

—খুব সুন্দর দেখতে। যাই বলো সাংঘাতিক দেখতে। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাকেও ভালবেসেছেন। পিঠে হাত রেখে ঘরে নিয়ে গেলেন, এসো ভাই, বলে। কে এমন করে গো আজকাল ! যাক আমার একজন ভাল বউদি হবে। কবে বিয়ে করবে ? বেশ সানাইটানাই বাজিয়ে হবে তো ! ফুলকো লুচি !

—ধ্যাস্, হাই সোসাইটির বিয়েতে সানাই মানাই হয় না। রেজিস্ট্রি। তারপর ছোট্ট একটা পার্টি। সেইভাবেই হবে। তবে পার্টিটা বাদ। মটোর মিস্ত্রীর বিয়েতে বড়লোক, আঁতেল সাঁতেল কেউ আসবে না। আমাদের তিনজনের পার্টি হবে, আমাদের ভাঙা হলঘরে। বাবার আমলের ঝাড়টা আবার ঝোলাব। ওইটাই তো আছে, আর তো সব ঝাড়তিস। না, একটা কার্পেটিও আছে। হাজার আলোর ঝাড়বাতি। চোখ ঠিকরে যাবে তোর। মনে হবে, স্বর্গে বসে আছিস ভগবানের জলসাঘরে।

—কী খাওয়াবে !

—চানাচুর, চা।

—থাক তোমাকে খাওয়াতে হবে না। আমি নিজেই কিনে খেয়ে নোবো।

—কী মুশকিল, এইসব বিয়েতে এর বেশি করা যায় না। ইচ্ছে থাকলেও যায় না। যে পুজোর যে-নৈবেদ্য ! এককালে আমাদের পাড়ায় এক জমিদার মন্ত্রী থাকতেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে। পাড়ার বিশিষ্ট প্রবীণরা নিমন্ত্রিত হলেন। রমণবাবু ছিলেন তাঁর বড় পেয়ারের। নির্বাচনের সময় তিনি কোমর বেঁধে

নেমে পড়তেন। রমণবাবু দু'দিন আগে থেকে জোলাপ খেতে শুরু করলেন। এইবার বিয়ের দিন সন্ধ্যায় রমণবাবু ধুতি পাঞ্জাবি পরে মাঞ্জা দিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন, পাঁড় কংগ্রেস ফিরে এলেন পাঁড় কমুনিস্ট হয়ে। ব্যাপারটা কী। টেরিফিক আলোফালো দিয়ে সাজানো বিয়ে বাড়ি। সানাই বাজছে। আতর গোলাপের পিচকিরি। বড় বড় রঙ বেরঙের গাড়ি। লনে গার্ডেন চেয়ারে বসে আছেন রথী মহারথীরা। হাতে হাতে সরবত। প্লেটে প্লেটে চানাচুর। রমণবাবু ওসব ফালতু জিনিস ছুঁলেন না। পেট ভার হয়ে যাবে। হাঁ করে বসে আছেন। ঘন্টাখানেক পরে অধৈর্য হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কখনখেতে ডাকবে? —খাওয়া! কেন সরবত, চানাচুর খাননি? শালা, বলে উঠে এলেন। পরের নির্বাচনে রমণবাবু কম্যুনিস্ট ক্যাম্পের অ্যাকটিভ্ কর্মী!

—কবে লাগাচ্ছ তাহলে?

—শুভস্য শীঘ্রং। দেখি সামনের মাসেই লাগিয়ে দেব। এর তো দিনক্ষণ কিছু নেই। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আসবেন। সই সাবুদ হবে, বিয়ে পাকা। আমি জানতুম ফিল্মস্টারের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। মীনাকুমারীকে ভালবেসেছিলুম সাধে! তাঁর কৃপা রে ভাই! তাঁর কৃপা।

কিশোরীদা তার এক পাঞ্জাবী বন্ধুর কাছে নিয়ে গেল। গাড়ির স্পেয়ার্সের ব্যবসা। বিক্রম সিং। আমাকে বললে, এই লাইনটা মাথায় রাখ্। বাঙালি বেশি নেই। খুব লাভের ব্যবসা। দেখ না, এখুনি তিনদিস্তে নোট নিয়ে কী রকম খুশ মেজাজে হাসবে দেখবি। লাখ লাখ টাকা কামাই, দু'হাতে রোজগার। বাঙালি হলে উড়িয়ে ফাঁক করে দিত। এ খুব টাইট লোক। আরে ভাই কিশোরীবাবু, বিক্রম সিং হই হই করে উঠল, আরে ইয়ার! আমরা বসলুম গদি আঁটা চেয়ারে। এসে গেল পাঞ্জাবী চা। মোটা দুধে তৈরি। দুজনে ব্যবসার কথা হল খানিক। তিন বান্ডিল টাকা এ-হাত থেকে ও-হাতে চলে গেল। বিক্রমের স্ত্রী এসে গেলেন, শালোয়ার কামিজ পরা, লম্বা চাবুকের মতো শরীর। ধারালো মুখ। গায়ে বিলিতি সেন্ট। কিশোরীদা কানে কানে বললে, পাঞ্চালী। দ্রৌপদীর বোন। মহাভারত পড়েছিস তো। মহিলা হেসে কিশোরীদাকে বললেন, হাউ আর ইউ। বিক্রমের পেছনে দাঁড়িয়ে, দুকাঁধে হাতের ভর রেখে নিজেদের ভাষায় কী বললেন মহিলা। এক বাণ্ডিল নোট হাতিয়ে চলে গেলেন। বিক্রম বললেন, ভেরি এক্সপেনসিভ ওয়াইফ। এভরি ডে শি উইল গো আউট ফর মার্কেটিং, অ্যান্ড পারচেজ অল শর্টস অফ রাবিশ।

ওর বাবা সেন্টারের আই. এ. এস অফিসার। আমার বিজনেসে একটু হেল্প হয়। তা না হলে বউ আমার ব্যবসায় লালবাতি জ্বেলে দিত। একটু তোয়াজ করি। লাইসেন্স-টাইসেন্সের সুবিধে হয়। শি ইজ মাই ক্যাপিট্যাল। ভাই এই বাজারে যে-ভাবেই হোক করে খেতে হবে। কম্পিটিটিভ মার্কেট। রেসের মাঠে ঘোড়া ছুটছে। গুড জকি না হলেই, লুজ দি রেস।

রাস্তায় এসে কিশোরীদা বললে, দুনিয়াটা কী কায়দায় চলছে মাইরি। যেন মাছ ধরা। যে যেখানে পারছে টোপ ফেলে বসে আছে। মাছ ঠোকরালেই মারছে টান। বিক্রম প্রথম বউটাকে বিদায় করে দিয়েছে। গ্রামের মেয়ে পছন্দ হল না। যেই পয়সা হল, এসে গেল হাল কেতার বউ। ড্রেস দেখেছিস! পাঁচ-ছ হাজারের কমে হবে না। গোটাটাই সিল্কের। তবে হ্যাঁ, ফিগার একখানা। বাঙালি মেয়েরা ধারে কাছে যেতে পারবে না।

কিছু হেঁটে, কিছুটা ট্রামে, বাসে, মানে কলকাতা ঘোরা হচ্ছে সারাদিন। সব শেষে চোরা মার্কেট। মাছের তেলে মাছ ভাজার জায়গা। কিশোরীদা বললে, কলকাতার একটা বড় ব্যবসা হল মটোর গাড়ির পার্টস চুরি। তোরই গাড়ির পার্টস তুই এখান থেকে কিনে নিয়ে যাবি! তোরটা খুলে এনে এখানে ঝেড়ে গেল, তুই এসে আবার সেটাকে কিনে নিয়ে গেলি। এই চলল সারা জীবনভর। তবে হ্যাঁ জবরদস্ত বাজার। যা চাইবি সব পাবি, দিশি, বিলিতি। আমার সঙ্গে কাজ করলে তোকে এখানে প্রায়ই আসতে হবে। জায়গাটা চিনে রাখ। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোবো। আমি একটা হাইড্রলিক ফ্লোর জ্যাক আর সেফ্‌টি স্ট্যান্ড কিনব। তুই শুধু দেখ। জ্যাক দিয়ে গাড়ি ঠেলে তোলা হয়। মাটি থেকে অন্তত আট-দশ ইঞ্চি ঠেলে তুলতে হবে। তুলে ধরে রাখতে হবে। স্লিপ করে পড়ে গেলেই খেল খতম।

আলু, পটল, ঢেঁড়স-এর মতো গাড়ির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢালাও বিক্রি হচ্ছে। দোকানে দোকানে জোরালো আলো। নিকেলের ঝলকানি। কিশোরীদা একজনকে খুব খাতির করে বললেন, মিঞা ভাই। দু'জনেরই গদগদ ভাব। ভেতর থেকে কিশোরীদার জিনিসটা বেরিয়ে এল। বেশ ওজনদার। একেবারে বিলিতি মাল। একটা ট্যাক্‌সি ডেকে তোলা হল। কিশোরীদা বললেন, তোর মা কিন্তু খুব দুঃখ পাবেন, যখন শুনবেন, তুই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে গ্যারেজের কাজে ঢুকছিস। সব মায়েরই তো আশা থাকে, ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে।

পেছনের সিটে দু'জনে বসে আছি আরামে। কিশোরীদাকে যতই দেখছি,

ততই যেন প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। কী অদ্ভুত একটা মানুষ। পাশে বসে আছে, কত সাহস, কত আপন! যেমন চেহারা, তেমন মন। হঠাৎ মনে হল, কিশোরীদাকে বলেই ফেলি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার কথাটা। একটা ছেলের ফাঁদে পড়ার বিচিত্র কাহিনী।

—কিশোরীদা। তুমি সেদিন কোথায় ছিলে, যেদিন আমার বাবাকে পাড়ার লোকে ঠেঙিয়েছিল?

—পানাগড়ে। মিলিটারি অকস্যানে মাল কিনতে গিয়েছিলুম।

—তুমি জানো কি হয়েছিল?

—কিছু কিছু। তোদের ফ্যামিলিতে এই রোগটা সকলেরই ছিল। মেয়েরোগ। ও নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করিসনি। একপাশে ফেলে দে। মানুষের ভেতরে অনেক পোকা থাকে। এও এক পোকা। ভেতর থেকে কুরে কুরে খায়। কিছু করার নেই। ক্যানসারের মতো। ভেতর থেকে কুরে কুরে খায় মানুষকে।

—আমি সেটা ভাবছি না। আমি ভাবছি অন্য কথা। ওই ঘটনার রাতে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা তোমার জানা দরকার। তুমি সরলামাসীকে দেখেছো?

—বহুবার। এখন আর দেখতে পাই না, শুনেছি, বিভাসের টাকাপয়সায় অবস্থা বেশ ফিরে গেছে। ভালই আছে।

—কেমন ভদ্রমহিলা?

—ওই একরকম। একটু এদিক সেদিক ছিল না যে তা নয়। একবার ওদের বাড়ির বাচ্চা চাকরকে নিয়ে খুব একটা কাণ্ড হয়েছিল। সে সব তোর না শোনাই ভাল।

—তাহলে শোনো, আর একটা কাহিনী। সেই রাতে সরলামাসীকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে আমাদের বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছে, সবাই বলে গেল একটু নজরে রাখা দরকার। এই সব কেসে মেয়েরা আত্মহত্যা করে। রাতে মশারির মধ্যে আমি আর মাসী, পাশাপাশি। মাসী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। বাবার আক্রমণে, টানাটানিতে ব্লাউজ, শাড়ি সব ছেঁড়াখোঁড়া। ঘুম আসছে না। পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে। একটা লোমঅলা বিশাল চেহারার লোক। চোখ দুটো ঢ্যালা ঢ্যালা, ওই রকম চেহারার একটা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেছে। শাড়ি ঝুলে ওপরে উঠে গিয়ে শরীরের ঢাকা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। গোল গোল পা। উরু। ব্লাউজ ফাঁসা

বুক। ছটফট করছে। হাত কামড়ে, খামচে মুক্তি খুঁজছে।

—অত বর্ণনা দিচ্ছিস কেন ?

—প্রয়োজন আছে কিশোরীদা। সবটা আমাকে বলতে দাও।

—বেশ, বলে যাও।

—কিছুতেই আর ঘুম আসে না। বসে আছি। মনে একটা বিশ্রী কুভাব আসছে। মনে হচ্ছে আমি সেই জানোয়ার যে আমার বাবা। কিশোরীদা বিশ্বাস করো, বয়েসটয়েস সব ভুলে আমি সেই রাতে যা করে ফেলেছি তা একজন বয়স্ক মানুষই হয়তো করে, যে অসভ্য, যে পশু, নরাধম। ভোর হয়ে গেল, বিছানা থেকে নামছি, বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো পালাব বলে, লম্বা দুখানা হাত আমাকে টেনে নিল বুকের ওপর, ভারী উরু দিয়ে আমাকে চেপে ধরল বেড়ালের মতো। ঘুম জড়ানো মুখে মা দুর্গার অসুর বধের হাসি। কিশোরীদা সেই থেকে আমি ওই মহিলার পোষা কুকুরের মতো হয়ে আছি। সারারাত আমাকে নিয়ে যা-তা খেলা করে। আমার ঘুমোবার উপায় নেই। দিনের বেলা স্কুলে বসে বসে ঢুলি। আমার আর পড়ায় মন নেই। আমি কিছু মনে রাখতে পারি না। আমার চেহারা ছিল রোগা-প্যাংলা, ভালমন্দ খাইয়ে মোটা করেছে। রোজ মালাই দিয়ে সিদ্ধির সরবত খাওয়ায়। নিজেও গেলাস গেলাস খায়। নেশা হয়ে গেলে উদ্দাম নাচে। পাগলির মতো খিল খিল করে হাসে। বলে, আমি ভৈরবী, তুই আমার কাল ভৈরব। ভেতরের ঘরে সব দরজা জানালা বন্ধ করে এইসব হয়। কোনও রকমে সকাল সাড়ে ছটা-সাতটার সময় আমি উঠে আসি। মহিলা তখনও সিদ্ধির নেশায় অসভ্যের মতো পড়ে থাকে চিৎ হয়ে।

—তোর মা কিছু বলেন না ?

—চেহারা দেখে আমার সহজ সরল বোকা মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, সারা রাত কী করিস। সরলার সঙ্গে যুদ্ধ। মা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না, ছেলের বয়সী একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের এমন বিশ্রী কিছু হতে পারে।

—তার মানে, তোর সর্বনাশ হয়ে গেল। তুই তো আর কোনওদিন স্বাভাবিক হতে পারবি না। তুই যদি না যাস !

—না গিয়ে আমি থাকতে পারব না। আমি আর মানুষ নেই কিশোরীদা, কুকুর হয়ে গেছি।

—ধর ওই মহিলাকে যদি বেপাত্তা করে দি। আমার সে ক্ষমতা আছে। তাহলে ?

—তাহলে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, না হয় আত্মহত্যা করব। আমার নেশা হয়ে গেছে।

—পাগল তো হবিই সিদ্ধির ঠেলায়। পাগল হবি, ইমপোটেন্ট হয়ে যাবি। সিদ্ধিতে তাই হয়। শিবের বুকে কালী নাচে, চিতার কাঠে হাঁড়ি চাপে। পাগলা ভোলা ষাঁড়ের পিঠে, শ্মশান কালী অট্টহাসে।

—কি করা যায় বলো না ?

—হাফ প্যান্ট আছে ?

—আছে।

—স্যান্ডো গেঞ্জি ?

—আছে।

—গামছা ?

—আছে।

—কাল সকাল সাড়ে আটটার সময়, হাফপ্যান্টটা পরবি, গেঞ্জিটা গায়ে চাপাবি, কোমরে গামছাটা বাঁধবি, সোজা চলে আসবি গ্যারেজে। তারপর পেতনী কি করে ছাড়াতে হয় আমি দেখছি। তোকে পেতনীতে ধরেছে।

—সরলামাসী কি খারাপ মেয়ে ?

—সরলামাসী খারাপ মেয়ে নয়, সরলা ভীষণ অসুস্থ। যখন ছোট ছিল তখন আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ, সে ভাই হতে পারে, দাদু হতে পারে, বাবা হতে পারে, মামা হতে পারে, পরিবারের নিকট কোনওজন, গৃহশিক্ষক, এমন কী কোনও মহিলাও ওকে নিয়ে খারাপ কিছু করত, যার ফলে মেয়েটা অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। যতদূর জানি ওর স্বামী পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত, ওকে সহ্য করতে পারত না। মনের জোরে বেরিয়ে আসতে পারলে পারবি, না পারলে মরবি। আর তোর আমার মৃত্যুতে কারও কিছু যায় আসে না।

কিশোরীদার গ্যারেজের সামনে গাড়ি থামল। মাল নামাবার জন্যে সাহায্য করতে গেলুম, বললে, উঁহু আজ না, কাল থেকে তুই আমার এমপ্লয়ি, আমি তোর এমপ্লয়ার। আজ আরামসে বাড়ি চলে যা।

—তোমার যত অদ্ভুত কথা। আজ আর কালে কী আছে। আজও তুমি আমার দাদা, কালও তুমি আমার দাদা। আমার মাথার ওপর কেউ নেই, তুমি ছাড়া।

তারক সরকার কাজ গুছোবার জন্যে এইরকম কথা অনায়াসে বলতে পারে ; কিন্তু মনের তলানিতে সব সময় ধান্দা, ছলে-বলে-কৌশলে কাজ গুছোতে

হবে। তুষ্ট করে ইষ্ট লাভ। মানুষের হরেক জাত। কেউ ভোলে মিষ্টি কথায়, কেউ চায় টাকা, কেউ ছোঁক ছোঁক করে মদ আর মেয়ে মানুষের জন্যে, কেউ দেখতে চায় চোখের জল। কেউ তুষ্ট গঙ্গাজলে, কেউ তুষ্ট প্রশংসায়। কেউ চায় গুণ, কেউ চায় খুন, কেউ চায় বড় মানুষের সঙ্গ। সেই গান আছে, তোমায় সাজাব যতনে কুসুম রতনে, মানুষের অহংকারকে বেশ ভালভাবে দলাই মলাই করতে পারলেই কাজ হাসিল। ময়দা যত ঠাসবে ময়ান দিয়ে, লুচি তত ফুলবে, তত খাস্তা হবে। সংসার হল হারমোনিয়াম। এক একটা রিড এক এক রকম সুর ছাড়ছে। খেলিয়ে বাজাতে যে জানে, সে এর থেকেই আহা মরি সংগীত বের করে আনবে। যে জানে না, তার হাতে বেসুরো প্যাঁ-পোঁ।

মালদুটোকে ধরাধরি করে নামানো হল। কিশোরীদা বললেন, তুই এবার যা। আমি এই গাড়িতেই আর এক জায়গায় যাব, তোর সঙ্গে কাল দেখা হচ্ছে, সকাল সাড়ে আটটা তোর অ্যাটেনডেন্স। আট ঘন্টা ডিউটি।

॥ চার ॥

সেই সময়ের কাগজে একটা ভয়ঙ্কর খুনের মামলার উল্লেখ আছে। হাইকোর্টের সেসানস পর্যন্ত পৌঁছে আইনের প্রবল লড়াই, চম্পা সরকার মার্ডার কেস। আততায়ী কে?

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম? ভয় পেয়ো না। যা জিজ্ঞেস করছি ঠিক ঠিক জবাব দেবে, ভেবে বলবে, সত্য গোপন করবে না। তোমার স্টেটমেন্ট কোর্টে পেশ হবে; তখন অস্বীকার করলে সাজা হয়ে যাবে।

: আমার নাম, তারক সরকার।

: বয়েস?

: ষোলো বছর পাঁচ মাস

: বাবার নাম?

: বিশ্বনাথ সরকার।

: পেশা?

: রেলে চাকরি করেন।

: মৃতা মহিলা তোমার কে হন?

: মা।

: তোমার বাবা তোমাদের সঙ্গে থাকেন না ?

: না।

: কেন ? বলো। আটকে গেলে কেন ? মায়ের সঙ্গে বনিবনা হত না ?

: না, তা নয়। মানে বাবার একজন ইয়ে আছে।

: ইয়ে মানে ? আর একজন স্ত্রী ?

: স্ত্রী নয় স্ত্রীলোক।

: তাই বলো, রক্ষিতা আছে। চরিত্রহীন। লুজ ক্যারেক্টার। তোমাদের ফেলে তিনি বেশ্যা রমণে ব্যস্ত। দিজ থিংগস আই ওন্ট টলারেট, নো, টলারেট। এই ল আর র-এর আগে পরে আমার জীবনে যাবে না। শোনো ছোকরা, চরিত্রহীনতা আমি একেবারে সহ্য করব না। ক্যারেক্টার ফাস্ট অ্যান্ড ক্যারেকটার লাস্ট। ফুটো চৌবাচ্চায় যতই জল ঢালো সব বেরিয়ে যাবে। এই মার্ডার তো সেই লোকটার কাজ, আমি তাকে ফাঁসীতে লটকাব। তবেই আমার নাম বিপিন বোস। বি বোস, টেরার অফ দি ক্রিমিন্যালস। তুমি তো দেখেছ। তোমার মুখ বলছে, তুমি দেখেছ। তোমার বাবা তোমার মাকে খুন করে দৌড়ে পালাচ্ছে। তুমি বাবা বলে, পেছন পেছন ছুটচো। তোমার বাবা একটা গাড়িতে উঠে পালাচ্ছে।

: আমার বাবা মোগলসরাইতে থাকেন স্যার।

: যে খুন করবে সে একই সঙ্গে দু জায়গায় থাকে, থাকতে পারে। এ আমাদের অভিজ্ঞতা। কেন মিথ্যে বলার চেষ্টা করছ। যে লোকটাকে পালাতে দেখলে, তার চেহারার বর্ণনা দাও।

: কোনও লোককে আমি পালাতে দেখিনি। দেখলে কেন বলব না। খুন হয়েছেন আমার মা। যে খুন করেছে সে ধরা পড়ুক এইটাইতো আমি চাইব।

: ঠিক। এ কথা জজেও মানবে। তোমার বাবার কলকাতার ঠিকানা ?

: হালসীবাগান।

: বাড়ির নম্বর বলো।

: সে কিশোরীদা জানে।

: সেই মহাপুরুষটি কে ?

: জমিদার বাড়ির ছেলে, একটা গ্যারেজের মালিক।

: কিশোরী, মটোর মেকানিক ! সে জানবে কেন ? সে এই খুনের মধ্যে আছে বুঝি !

: আমাকে ব্যাপারটা বলতে দেবেন স্যার ?

তখন রাত হবে সাড়ে নটা কি দশটা। কিশোরীদার গ্যারেজ থেকে বাড়ি ফিরছি। ভয়ে ভয়ে, রাত হয়ে গেছে। সদর দরজা হাট খোলা, কোথাও কোনও আলো নেই। বাড়ি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ভাবলুম, মা হয়তো হরিসভায় গান শুনতে গেছে। পাশেই তো হরিসভা। কিন্তু, দরজা খোলা কেন ? সব অন্ধকার। হাতড়াতে হাতড়াতে ঢুকলুম ভেতরে। উঠন, দালান, খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। এমন কী আমাদের বেড়ালটাও অদৃশ্য। শোবার ঘরের দরজার একটা পাল্লা খোলা, আর একটা ভেজানো। মেঝেতে সাদা মতো একটা কী। ডাকলুম মা মা। সাড়া নেই। ছুটে বেরিয়ে এলুম। সোজা সরলামাসীর বাড়ি। সরবত খাচ্ছিলেন। শোনামাত্রই হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল। তখনও নেশা জমেনি তেমন। টর্চ নিয়ে আমার সঙ্গে এল। আলো জ্বালানো হল। আমার মায়ের নিষ্প্রাণ দেহ মেঝেতে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। গলায় একটা সিল্কের দড়ির ফাঁস একেবারে খাপ হয়ে বসে গেছে। হাত দুটো মুঠো করা। পায়ের পাতা দুটো সিঁটিয়ে আছে। মেঝেতে মায়ের মুখের কাছে সামান্য একটু রক্ত গড়িয়ে এসেছে।

বিছানার চাদরের একটা কোণ ঝুলে মেঝেতে চলে এসেছে। আলমারির ডালা ভাঙা। মায়ের গয়নার বাক্সটা নেই। যাঁরা অনুসন্ধানে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শুরু হল আলোচনা।

—উদ্দেশ্য চুরি না খুন ! চুরি করতে এসে খুন করেছে, না খুন করতে এসে চুরি !

—মাইণ্ড ইট দিস দড়ি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ? দিস ইজ দি ওনলি ইন্স্ট্রুমেন্ট ফর মার্ডার। এই দড়ি ধরে টানলেই খুনী এসে যাবে।

—সার্চ দি রুম থরোলি।

সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল চোখের সামনে। আসল ডাকাত যেন পুলিস। খাটের পেছন দিক থেকে, দেয়াল আর পায়ের দিকের পায়ার ঘুপচিতে পড়ে আছে একটা চশমা !

—তোমার মা চশমা পরতেন ?

—না।

—তোমার বাবা ?

—বাবার চোখ ভীষণ ভাল।

—তোমার সরলামাসী ?

—না।

—এই চশমা তুমি আগে কখনও কারও চোখে দেখেছ ? মনে পড়ে ?

—আজ্ঞে না।

—দিস ইজ সেকেণ্ড অবজেক্ট। খুনী একজন অথবা দু'জন। বিছানা থেকে গলায় দড়ির ফাঁস আটকে টেনে নামানো হয়েছে। দরজা অব্দি টানতে টানতে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ ওই পর্যন্ত গিয়ে তবেই ভিকটিম মরেছে। দরজা বন্ধ করে এই অপরাধ করা হয়েছে। দরজার একটা পাল্লা খুলে অপরাধী অন্ধকারে সরে পড়েছে। দরজা বন্ধ করেছে যখন তখন বুঝতে হবে আততায়ী মৃতার খুব পরিচিত। তোমার মায়ের চরিত্র কেমন ছিল ?

—দেবীর মতো।

—তোমাদের আর কোনও আত্মীয়-স্বজন আছে ?

—না তেমন কেউ নেই।

—এই যে মাসী মাসী করছ। মাসীর স্বামী নেই ?

—পাতানো মাসী, বিধবা।

—তাকে একবার ডাকো।

—এখন তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। পুজোয় বসেছেন। সারারাত পুজো করেন।

—বাবা ! একদিকে ধর্ম যেমন বাড়ছে, অধর্মও সেই হারে বাড়ছে। তাজ্জব দুনিয়া। তুমি এখন পাড়া ছেড়ে কোথাও যাবে না। পুলিসের অনুমতি ছাড়া।

ঘর সিল করে ডেডবডি নিয়ে পুলিস চলে গেল। অন্ধকারে বসে রইলুম দাওয়ায়। তারক সরকারের ভূতের ভয় ছিল খুব। ভূত পালিয়েছে। জীবন একেবারে আকাশের মতো শূন্য হয়ে গেল। পরিষ্কার। কেউ কোথাও নেই। একটা কথা পুলিসের কাছে আমি চেপে গেছি, ঘরে ঢুকেই আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, মাথার তেলের। জুঁই ফুলের গন্ধ। এই তেলটা আমার বাবা বরাবর মাথায় মাখেন। এখনও হয়তো এই তেলই ব্যবহার করেন। তাহলে !

কিশোরীদার গ্যারেজে দৌড়ালুম। রাত ঝিঁঝিঁ করছে। রাস্তায় মানুষ নেই। কুকুরের খেয়োখেয়ি। কিশোরীদা ফূর্তিবাজ মানুষ। কোথায় গিয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে, কে জানে ! দিনে সে একরকম, রাতে আর একরকম। অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিশাল জমিদার বাড়ির কঙ্কাল। একপাশেই ভেঙে ঢিপি'র মতো হয়ে আছে। আর একপাশ সারিয়েসুরিয়ে নতুন করা হয়েছে। বিরাট একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঝিমঝিম

করছে। দিনের বেলা পাতা খুলে ছড়িয়ে থাকে! সুন্দর শোভা। রাতে দু ভাঁজ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন যেন ভয় ভয় করে। গ্যারেজের বড় লোহার গেট বন্ধ। একটা কুকুর গেটটার সামনে আরামে শুয়ে আছে। নিজেকে মনে হচ্ছে, আমিও একটা কুকুর। একটা জিনিসেরই অভাব, সেটা হল একটা ন্যাজ। ঘন্টাখানেক বসে থাকার পর শরীরে একটা টান অনুভব করলুম। কেউ যেন দূর থেকে আমাকে দড়ি ধরে টানছে। সরলামাসীর টান। সাদা নগ্ন একটা দেহের টান। শরীর নিয়ে খেলা করার আনন্দ। মা মারা গেছেন তো কী হয়েছে। তারক গুহাইতের মনটা চিরকালই এইরকম। কোনও কিছুই তার মনে রেখাপাত করে না, একমাত্র দগদগে, রগরগে ভোগ ছাড়া। সে বোঝে নিজের ভোগ, নিজের শরীর। দেহ কাল দুপুরের আগে পুলিস ছাড়বে না। তাহলে হাঁ করে এখানে বসে থেকে আমার লাভটা কী হবে। আমার মা ফিরে আসবেন? লোকে আমার প্রশংসা করবে? মানুষের নিন্দে, প্রশংসার আমি ধার ধারি না। টাকা থাকলে লোক খাতির করবে, টাকা না থাকলে ধাক্কা মেরে খানায় ফেলে দিয়ে চলে যাবে। মানুষকে দিতে পারলেই ভাল, না পারলেই খারাপ। আমার বাবার মতো মক্কেলকে বিয়ে করলে মরতেই হবে, হয় না খেয়ে অথবা খুন হয়ে। এর একটাই হয়েছে। আর পৃথিবীতে আমাকে আনা! এর চেয়ে সহজ কাজ কিছু নেই। একটা গবেট, নিরেট, আধপাগলাকেও একজন মহিলা দিলে এক ডজন ছেলে মেয়ে করে দেবে। পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ। এর জন্যে পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, জননী জন্মভূমিশ্চ সর্গাদপি গরীয়সী বলে গদগদ হওয়ার কিছু নেই। কিশোরীদা আষ্টেপৃষ্টে বিষয় সংক্রান্ত মামলার চাপে মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে বলে, ছেলে-মেয়ে হল প্রেমের বাইপ্রোডাক্ট। মানুষ করা হয় স্বার্থে—বুড়ো বয়েসে ছেলে আমাকে দেখবে। রোজগার করে খাওয়াবে। বাপ-মাকে তীর্থে নিয়ে যাবে। যে বাপ মাল খেয়ে বেশ্যাবাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকে তাকেও নিয়ে যাবে। যে মা সারাজীবন ছেলেকে লাথিয়ে গেল তাকেও নিয়ে যাবে। আর মেয়েকে চালান করে দেবে প্রেমের ফ্যাকট্রিতে—যাও বাছা! শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নিজের পাওনা বুঝে নাও। বাপেরবাড়িতে তোমার খাতির নেই। তুমি নেবে, দেবে না কিছুই। তাই বিদেয় হও। শাঁকের ফুঁ মেরে 'যদিদং হৃদয়ং করে' এক ষণ্ডেশ্বর জুটিয়ে দাও। এই তো জীবন, যেদিকে তাকাও। বেয়ারা হুইস্কি লাও। আমার নাম তারক সরকার। লোকে আমাকে গুহাইত বলে।

হঠাৎ মোড় ঘুরে একটা সাইকেল রিকশা আসছে। ক্লান্ত চালক। ক্লান্ত

আরোহী। সাদা ট্রাউজার গাঢ় রঙের পোলো শার্ট পরা কিশোরীদা বাঁ দিকে হেলে আসছে। চালক আর আরোহী দু'জনেই টেনে আছে। কিশোরীদার অদ্ভুত কিছু বন্ধু আছে। রিকশাঅলা, ভুজাঅলা, ঠেলাঅলা, চৌকিদার, বাজারের আনাজঅলা, মাছঅলা, মাছউলী। ভদ্দরলোকের সঙ্গে মেলামেশা মানেই এক পরচর্চা, নিত্যদিন। এদের জীবনের অভিজ্ঞতা বাস্তব, জীবনবিশ্বাস খাঁটি। পরিশ্রমের ভাত খায়, মাল খায়, মারামারি করে, যে বউকে পেটায়, পরক্ষণেই সেই বউকেই বিছানায় জড়িয়ে ধরে প্রেম করে। এরা দেয়, ভদ্দরলোক একমাত্র জ্ঞান আর উপদেশ ছাড়া কিছু দেয় না। কিশোরীদা নামছে। এক মাতাল আর এক মাতালকে সাহায্য করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে। কিশোরীদা ধমকাচ্ছে, সহ্য হয় না যখন অতটা টানলি কেন ?

—কিশোরীদা ? ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

—তুই ? সাড়ে আটটা বেজে গেছে ? এত অন্ধকার। মেঘ করেছে বুঝি ! ঝড় আসছে ?

—তোমাকে কখন থেকে খুঁজছি। আমার মা খুন হয়েছে। ডেডবডি থানায় নিয়ে গেছে।

—খুন। এ পাড়ায় খুন ? নেশা করেছি বলে ইয়ার্কি করছিস ?

—বিশ্বাস করো। গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে গেছে।

—এ শালা সেই বিশ্বনাথ সরকারের কাজ। সেদিন গিয়ে ডালিমকে তড়পে এসেছিলুম, তোমার পিরীতের নাঙের পে অ্যাটাচ করা হবে। হাতে আর তোমার ওই দুটো নয় হ্যারিকেন ধরতে হবে। শালা, মাতাল, মাগীবাজ, ঘুসখোর। পাপে চুর হয়ে আছে। এইবার তোর পেছনে লাথি মেরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে। দাঁড়া, আগে চৌবাচ্চার ক্যাঙলা জলে ডুবে আসি। নেশাটা মাথায় চড়ে গেছে। তুই আয়। তোর খাওয়া হয়নি। স্যাণ্ডউইচ আর হাফ পেগ ব্র্যাণ্ডি চালিয়ে দে।

কিশোরীদার বাড়িতে জমিদারী আমলের মার্বেল পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চাটা আর দু'একটা সাবেক জিনিসের মতো অটুট ছিল। কিশোরীদা আণ্ডারওয়্যার পরে ঝপাং করে সেই জলে তলিয়ে গেল। এক সময় ভিজে শরীরে উঠে এল। মাথায় বড় বড় ভিজে চুল বার কয়েক ঝাঁকিয়ে নিল।

—একটা তোয়ালে টোয়ালে দেখ না !

—কোথায় আছে বলো ?

—ভেতরের ঘরে দেখ না !

লম্বা বারান্দা অনেক দূর চলে গেছে। সবে ভোর হচ্ছে। গোলাপী আলো খেলছে পাথরের মেঝেতে। একেবারে শেষ মাথায় একটা পাথরের স্ট্যাচু। নেই নেই করেও কিশোরীদার অনেক আছে। অনেক ঘর। সব ঘরই তালা মারা। একটা ঘরই খোলা। ঢুকতেই সামনের দেয়ালে বেশ বড় একটা ছবি। দেবীর মতো সুন্দরী এক মহিলা। নিশ্চয় কিশোরীদার মা—মেম বউ। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ দরজার চৌকাঠে। হঠাৎ মনে হল, তোয়ালে। নিখুঁত সাজানো ঘর। আলনায় ধবধবে সাদা তোয়ালে। লোকটার কি সবই সুন্দর ? কে একজন কানের কাছে বলে উঠল—তারক সরকার ! তুমি কোনও দিনই এইরকম একটা মানুষ হতে পারবে না ! তুমি শুধু দেখে যাও।

— কী রে শালা ? তোয়ালে কি বুনে আনছিস ?

তোয়ালে হাতে দৌড়ালুম, ভোর মাড়িয়ে। উষসী আলোর জমজমায় প্রকৃতি জাগছে। প্রথম পাখির টিটির টিটির ডাক। ভিজে বাতাসে দুলছে মাধবী, মালঞ্চ। এক মা ছবি হয়ে দেয়ালে দুলছে, আর এক মা শুয়ে আছে মর্গে। একটু পরে হৃদয়হীন কিছু লোক ধারালো ছুরি দিয়ে দেহটা ফেঁড়ে ফেলবে। ওই যে দিন এলে আমার দুঃখ আসে রাত এলেই আসে ভোগ। চোখে জল এল। বুকের হাপর তোলপাড়। উনুন নিবে গেল চিরতরে। রান্নার সময় চুড়ির কিনিকিনি শব্দ নীরব হল চিরতরে। চিরতরে নিস্তব্ধ হল আমাকে ডাকার কণ্ঠস্বর। পাহাড় থেকে পড়ে গেছি মহাশূন্যে। একটুকরো ছেঁড়া কাগজ।

তারক সরকার গুছাইত হলেও তার তো একটা মন আছে। সে মনে সাজানো আছে একের পর এক ঘটনা। বিশ্বনাথ সরকার চম্পা সরকারের বদলে পেলেন ডালিম। ডালিম নামিয়ে দিলে একটা বাচ্চা বিশ্বনাথ। তারক সরকার চম্পা সরকারের বদলে পেয়ে গেল সরলামাসী। চম্পা সরকারের বরাতে শূন্য নয় মহাশূন্য। আমাদের পাড়ায় লক্কা রেস খেলত, আরও একজন খেলত, ফক্কা। লক্কা ভাইসরয় কাপে একলাখ পেয়ে গেল। ফক্কা বরাত ঠুকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেছিল। সব চৌপাট। সেই রাতেই ফক্কা উন্মাদ হয়ে নেমে পড়ল পথে—একটাই বুলি—যাক শালা, লক্কা লাক, ফক্কা ফাঁক !! ডালিম লাখ, চম্পা ফাঁক। তারক সরকার কাঠগড়ায়।

কিছুকাল শহর কলকাতায় মহা উত্তেজনা। সকলের মুখে মুখে ফিরছে—চম্পা সরকার মার্ডার কেস। বটতলার কবি লিখে ফেললেন পাঁচালি—এক আনা দাম :

শোনো শোনো কী আশ্চর্য কলির কাহিনী ।
রেল কোম্পানির মালবাবু মারলে বৌরানী ॥
পিরীতের মেয়েমানুষ পুকুরপাড়ে ঘোরে ।
ছিপ ফেলে মালবাহী মালের আশায় বোসে ॥
সতী সাবিত্রী এয়োরানী মুখ বুজে দেখে ।
কর্তামশাই পিষছে ডালিম বুকের ওপর বোসে ॥
বাংলার ঘরে ঘরে কুলবধূ খুন ।
এদেশের পুরুষের কতই না গুণ ॥

হাইকোর্টেতে লোক না ধরে মাগো! অভীরামের দ্বীপ চালাল মা, ক্ষুদীরামের ফাঁসি ।

জমজমাট আদালত কক্ষ । পাবলিক প্রসিকিউটার যেন নাটক করছেন ।

—মি লর্ড ! আসামী বিশ্বনাথ সরকার একজন শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালি । ইস্টার্ন রেলের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত । কলকাতায় ছিলেন । দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে মোগলসরাইতে বদলি করা হয় । এই যে দায়িত্বে অবহেলা, মি লর্ড ! এটা খুব নরম শব্দ, ভদ্র শব্দ, ইংরেজি ভাষায় স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ, গ্রস নেগলিজেন্স ইন ডিউটিস । সোজা বাংলায়, লোকটা চোর । পাকা চোর । একা চুরি করে না, পাঁচজনকে নিয়ে চুরি করে । পাপের বলয়ে সবাইকে জড়িয়ে নেয়, তার মধ্যে অবশ্যই একজন বড় কেউ থাকে, ফলে পানিশমেন্টটা সব সময় মাইল্ড হয়, একস্ট্রিম হয় না । এইবার আমি একটা গ্রাম্য গল্প বলব—মেয়ের বিয়ে দেবেন এক ভদ্রলোক । পাত্রের খোঁজ করছেন । ঘটক বলছেন, ছেলেটি খুব ভাল, তবে একটাই একটু আপত্তির হতে পারে, মাঝে মধ্যে পেঁয়াজ রসুন খায় । না, রোজ খায় না, যেদিন মাংস-টাংস খায় সেইদিন খায় । মাংস রোজ খায় না, যেদিন মদ খেয়ে বেশ্যাবাড়ি যায় সেইদিন । এও রোজ নয়, যেদিন রেসের মাঠে মোটা কামাই হয় সেইদিন যায় । ছেলে মশাই খুব ভাল । ধর্মাবতার । আসামী বিশ্বনাথ সরকার রোজ চুরি করে না, মাঝেমাঝে, যখন তার পোষা মেয়েমানুষ গয়নার আব্দার ধরে । বিশ্বনাথ সরকার নিজের সতীসাধ্বী স্ত্রী ও তার একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে, তাদের অসীম দারিদ্র্যে ভাসিয়ে ডালিম নামক এক ডাঁশা বেশ্যাকে নিয়ে আলাদা ফূর্তির সংসার পেতেছে । এতেও সে তৃপ্ত হতে পারেনি, এমনি তার দুর্বার কাম । একদিন সে তার বিবাহিত স্ত্রী শ্রীমতী চম্পা সরকারের সঙ্গে দেখা করতে আসে তার সাবেক পৈতৃক বাড়িতে । উদ্দেশ্য ছিল, যাবতীয় গহনাপত্র, দামি জিনিস

সরিয়ে নিয়ে যাবে তার রক্ষিতার সেবায়। এমন সময় প্রতিবেশিনী, বিধবা যুবতী সরলা চৌধুরী নিত্য যেমন আসেন, এসেছিলেন অভাগিনী চম্পা সরকারের খোঁজখবর নিতে। আসামী বিশ্বনাথ সেই সময় মদে চুর হয়েছিল। দুর্ভাগ্য সরলার। বিধবা হলেও যুবতী, অতীব আকর্ষণীয় তাঁর চেহারা। আসামী বিশ্বনাথের চরিত্র এমনই, এমনই সে কামপীড়িত, যে স্ত্রী ও উত্তীর্ণ কৈশোর পুত্রের সামনেই, আলোকোজ্জ্বল ঘরে সরলা চৌধুরীকে ধর্ষণ করে। সেই রাতে যে-ডাক্তার সরলার চিকিৎসা করেন, মি লর্ড, তাঁর লিখিত বিবরণ আপনার সমূখে পেশ করা হয়েছে। পেশ করা হয়েছে আসামীর সার্ভিস রেকর্ড, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মতামতসহ। সেই রাতে পল্লীর সমাজসচেতন কিছু মানুষ আসামীকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে স্থানীয় পতিতা পল্লীতে পাচার করে দিয়ে আসেন। অসীম ভদ্রতাবশত তাঁরা আসামীকে পুলিসের হেফাজতে তুলে দেননি, কারণ এর সঙ্গে অসহায় এক বিধবার সম্ভ্রম ও সম্মান জড়িত ছিল। সাক্ষী হিসাবে এই মামলায় তাঁদের তিনজন উপস্থিত আছেন। তাঁদের জবানবন্দী থেকে স্পষ্ট হবে আসামীর জঘন্য সমাজবিরোধী চরিত্র। হি ইজ নো রেসপেক্‌টার অফ মরাল্‌স, অ্যাবসলিউটলি লাইসেন্‌সাস অ্যাণ্ড লেচেরাস। মানুষকে সময়ে আইনের দ্বারা সংযত করতে না পারলে সে কত সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, আসামী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্ত্রী এবং পুত্রের ভরণপোষণে উদাসীন আসামী বিশ্বনাথ সরকার তার সমস্ত উপার্জন ও চুরির অর্থ রক্ষিতার বিলাসে ব্যয় করেছে। প্রমাণ তার ঐশ্বর্য। তার অ্যাসেটের একটি তালিকা মহামান্য বিচারকের অনুধাবনের জন্যে পেশ করা হয়েছে। একদিকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন পুত্র-পরিবার, অন্যদিকে মদ্য ও মাংসসহযোগে এই ঘৃণ্য অপরাধীর চলছে রক্ষিতা বিলাস। আইন, সমাজ, এই অপরাধ কখনও ক্ষমা করবে না। পৃথিবীর কোনও দেশই ক্ষমা করবে না মানুষের এই নৈতিক অধঃপতনকে। ক্রিমিন্যাল জাস্টিস সম্পর্কে ইংরেজদের নীতি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, সাম্যহীন। মহামান্য বিচারপতি সবই জানেন, তবু স্মরণ করাতে আপত্তি নেই ব্রিটেনের ক্রাউন কোর্ট, যেখানে এই ধরনের মামলার বিচার হয়, সেখানে লর্ড চ্যানসেলারের সতর্ক নির্দেশ হল—দ্য গভর্নমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফর ডিলিং উইথ ক্রাইম ইজ প্রিভেন্ট ইট, হোয়ার পসিবল, টু ডিটেক্ট সাসপেক্টস, টু কনভিক্ট দ্য গিল্টি অ্যান্ড অ্যাকুইট দ্য ইনোসেন্ট, টু ডিল উইথ দো'জ ফাউন্ড গিল্টি,অ্যান্ড টু প্রোভাইড মোর এফেক্টিভ সাপোর্ট ফর দ্য ভিকটিমস অফ ক্রাইম। ইট ইজ অলসো কনসার্নড টু মেইনটেইন পাবলিক

কনফিডেন্স ইন দ্য ক্রিমিনাল জাসটিস সিস্টেম অ্যান্ড এ প্রপার ব্যালান্স বিটুইন দ্য রাইটস অফ দ্য সিটিজেনঅ্যান্ডদ্য নিডস অফ দ্য কম্যুউনিটি এজ এ হোল। আইন হবে নিরপেক্ষ, ক্ষমাহীন। নাগরিক অধিকার রক্ষায় যেমন সজাগ তেমনি নাগরিক প্রয়োজনের প্রতি রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি। নৈতিক অবক্ষয় আমাদের অস্তিত্বকে সর্বাধিক বিপন্ন করে। ক্রাউন কোর্টে হেনরি ভারসাস ট্র্যাসি মামলার রায় দিতে গিয়ে অনারেবল জাস্টিস ম্যাক্‌কিন্‌লি বলেছিলেন : Moral degradation grows into the vital of human existence মি লর্ড। এই নৃশংস, জঘন্য, সুপরিকল্পিত হত্যাকারীকে Who murders for pleasure for sex যদি আইন অনুযায়ী extreme punishment দেওয়া না যায়, তাহলে মানুষ আদালতের উপর বিশ্বাস হারাবে, অপরাধীরা আরও সাহসী হয়ে উঠবে। to prevent crime আমাদের ভূমিকা হবে হাস্যকর।

আমি আমার চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি, অপরাধী বিশ্বনাথের Modus operandi একজিবিট নাম্বার ওয়ান, একটা সিল্ক কর্ড which is the instrument of the murder. মহামান্য ধর্মবিতার এই সিল্কের কর্ড বিশেষ ধবনের কর্ড। সহসা হাটে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। এই কর্ড রেল কোম্পানির সম্পত্তি। এতে গার্ড সাহেবরা হুইস্‌ল্ বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। এই বস্তু অপরাধীর সহজে আয়ত্ত ; কারণ সে রেলের মালবাবু। এই সিল্ক কর্ড প্রাণহীন, কিন্তু ভাষাহীন ভাষায় দুটো জিনিস ইণ্ডিকেট করে, এক বিশ্বনাথ সরকার শুধু খুনী নয়, সে একজন পাকা চোর। রেলের ছোটবড় যাবতীয় সম্পত্তি অপহরণই তার সম্পদের উৎস। ঘটনার রাতে বিশ্বনাথ সরকার কাগজে-কলমে মোগলসরাইতে থাকলেও আসলে সে ছিল কলকাতায়। একই সঙ্গে একজন মানুষ দু'জায়গায় থাকে কী করে। এইখানেই অপরাধী প্রোফেশনাল মার্ডারারের মতো কাজ করেছে। হুইচ প্রুভস বিয়ন্ড ডাউট, হিজ ইনটেনশন টু কিল দ্য ভিকটিম মেথডিকালি অ্যান্ড প্রফেশনালি। ক্রাইমের দুদিন আগে জেনারেল হসপিটালে অ্যাডমিশন নেয়। পেটের কমপ্লেন। নামটা তার, লোকটা আর একজন। বিশ্বনাথের প্রয়োজন ছিল, অ্যাডমিশন অফ ডিসচার্জ সার্টিফিকেটটুকুর in the meantime he safely came to calcutta killed his wife and silently back to Mogol Sorai রেল তার হাতে, যে কোনও সময়, যে কোনও ট্রেনে। সে চলা ফেরা করতে পারে। ধর্মবিতার ক্রাইমে তিনটি এমের খেলাই প্রধান—ম্যান, মার্ডার, মবিলিটি। আততায়ী চট করে আসবে, কাজ হাসিল করে চটজলদি সরে

পড়বে। এই অপরাধী সরকারি পদ, সুযোগ-সুবিধে ক্রাইমের কাজে লাগিয়েছে—দ্যাটস অ্যানাদার অফেনস। ক্রাইম ওয়াজ কমিটেড। ঘটনা যেদিন ঘটবে এক বিশ্বনাথ সরকার হাসপাতালে অ্যাডমিশন নিয়েছিল জেনারেল ওয়ার্ডে। আর এক বিশ্বনাথ সরকার নিয়েছিল সিক্‌লিভ। দুজন এক নয়। দেহের বাক্স মোটামুটি এক হলেও, দুজন আলাদা লোক। যদিও ঠিকানা একই। ধর্মাবতার আমাদের হাসপাতাল পেশেন্টদের আইডেন্টিটি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করেন না। কার চিকিৎসা করলুম। কাকে ভর্তি করলুম, কাকে রিলিজ করলুম। There must be an identity card with a passport Size photograph. বিশ্বনাথ সরকার হাসপাতালে ছিল না, ছিল কলকাতায় তার রক্ষিতার বাড়িতে। সেখান থেকে রাত সাড়ে আটটার সময় বেরিয়ে প্রথমে যায় হোটেল রয়ালে। সেখানে দু'পেগ রাম খেয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সে আসে নিজের পাড়ায়। অন্ধকারে তাকে কেউ না চিনলেও মোড়ের পানবিড়ির দোকানের মালিক তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল। বিশ্বনাথ সরকারের চোখে চশমা ছিল। ইদানীং লেখাপড়ার সময় চশমা ব্যবহার করতে হচ্ছিল, কারণ বাঙালির চোখে চল্লিশের পর থেকেই চালশে ধরতে শুরু করে। বিশ্বনাথ সরকার চশমা পরেই পাড়ায় ঢুকেছিল। সামান্য ভোল পাল্টাবার চেষ্টা। যথেষ্ট জোরেই হাঁটছিল হনহন করে। প্রদর্শিত চশমার পাওয়ার আর অভিযুক্তের চোখের পাওয়ারে মিল পাওয়া গেছে। পাওয়ার হয়তো একই হতে পারে একাধিক লোকের। এক হয় না অ্যাকসিস। এ-ক্ষেত্রে অ্যাকসিসও মিলে গেছে। এই কেসে অ্যাকসিস একটা বড় পয়েন্ট। সেই ভয়ঙ্কর রাতের গা-হিম করা নাটকে আমরা উপস্থিত না থাকলেও আততায়ী যে-সব সাক্ষ্যপ্রমাণ রেখে গিয়েছিল, সেই জড়প্রমাণই দৃশ্যের পর দৃশ্যের পর্দা তুলে আমাদের দর্শকের আসনে বসিয়ে দেয়। আততায়ী অনুতপ্ত স্বামীর ভূমিকায়। স্ত্রী চম্পা সরকার স্বামীর যাবতীয় বদগুণ থাকা সত্ত্বেও আদর্শ হিন্দু রমণীর মতোই সেই মদ্যপ, লম্পট মানুষটাকে তাঁদের শয়নকক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘর, সেই পালঙ্ক, সেই বিছানা, সেই মধুযামিনীর স্মৃতি। বিপথগামী স্বামী ফিরে আসতে চাইছে পরিত্যক্তা স্ত্রীর কাছে। দীর্ঘ স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা রমনীর মনে প্রেম জাগতেই পারে মি লর্ড। বহুকাল পরে দু'জনেই বিছানায়। বাড়ি শূন্য, নির্জন। রাত তখন নটা। পুত্র বাইরে। আসামী দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে রমণক্রিয়ায় রত হল। শয়তান। মারার আগে ভোগ করে নিতে চায় সহধর্মিণীকে—আঁচড়ে,

কামড়ে, যন্ত্রণা দিয়ে। এসব সে নতুন শিখেছে বাজারি মেয়েছেলেদের কাছ থেকে। সেক্সোলজির পরিভাষায় যাকে বলা হয় Pleasure in pain মহামান্য ধর্মাবতার দ্য সাদের জাস্টিন ও বেডসাইড স্টোরির কথা স্মরণীয়। যৌন বিকৃতি মানুষকে পশুতে পরিণত করে। তাদের তখন আর কোনও ধর্ম থাকে না : They turn into beast' beastility in sexuality বহুকাল পরে স্বামীসহবাস। হতভাগ্য মহিলা যন্ত্রণা পেলেও সহ্য করে যাচ্ছেন, স্বামীকে ফিরে পাবার বাসনায়। আসামী সোহাগের ছলে গলায় সিল্কের দড়ির ফাঁস লাগাচ্ছে। আর এক যৌন খেলা, হঠাৎ টান। হতভাগ্য রমণী ভাবছেন—এ বুঝি স্বামীর নতুন কোনও আনন্দ। আসামী টানছে। টানতে টানতে খাটের কিনারায়, সেখান থেকে মেঝেতে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। জিভ ঠোঁটের ফাঁকে, অসীম জীবনীশক্তি। খাট থেকে দরজার ব্যবধান দশ ফুট। ন'ফুটের মাথায় হার সোল ওয়াকড় আউট। ঘড়িতে তখন ঠিক রাত দশটা। সেদিন ছিল অমাবস্যা। মহামান্য বিচারপতির সামনে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। মহিলার গালে, বুকে, উরুসন্ধিতে দংশনের চিহ্ন ছিল। কয়েকটি বেশ গভীর। সেখানে দাঁতের যে মাপ পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আসামীর দাঁতের মাপের মিল আছে। নিহত মহিলার যোনীদেশে একটি পুরুষের পিউবিক হেয়ার পাওয়া গিয়েছিল। রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গেছে আসামীর যোনীকেশের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। পরীক্ষার রিপোর্ট মহামান্য বিচারপতির সামনেই আছে। যৌন অপরাধে অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার সময় গ্লাসগো আদালতের মহামান্য বিচারপতি লর্ড ক্যামেরন বলেছিলেন— A man may be very bad without being mad পাগল না হয়েও মানুষ বীভৎস রকমের খারাপ হতে পারে। আসামী বিশ্বনাথ সরকার তার উদাহরণ। সব খুনেরই একটা মোটিভ থাকে। লাভবান হবে বলেই মানুষ খুন করে, খুন করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। পয়সা নিয়েও খুন করে। Murder for gain', murder to take revenge, professional murder. Murder for Sexual pleasure বিশ্বনাথ সরকার স্ত্রীকে খুন করেছে একটি মাত্র কারণে, একটা সম্ভাবনার আতঙ্ক। চম্পা সরকার আদর্শ হিন্দু রমণী, পতি অপদেবতা হলেও তাঁর কাছে দেবতা। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ির বাড়ি যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। পতিদেবতার সমস্ত অপকর্ম সহ্য করাই ছিল তাঁর আদর্শ, তাঁর স্ত্রীধর্ম। তাহলে ? ছেলে লায়েক হচ্ছে। নিয়ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বাবার ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠছে। পাড়ার সমাজসেবী

যুবক, শিল্পমালিক, আদর্শপরায়ণ উচ্চ বংশজাত কিশোরীমোহন ঘোষকে সে দাদা বলে। তারা দুজনে গিয়ে বিশ্বনাথ সরকারের অনুপস্থিতিতে তার রক্ষিতাকে শাসিয়ে এসেছিল—চম্পা সরকারকে দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে বিশ্বনাথের পে-অ্যাটাচ করাবে। এছাড়া সরলা কেলেঙ্কারির রাতে পাড়ার লোক ডেকে বিশ্বনাথকে প্রহার করা হয়েছিল। প্রতিশোধ ও প্রমোদের পথের কাঁটা সরাবার জন্যে নিরীহলম্পট, সাহসীখুনীর ভূমিকায়। বিশ্বনাথ সরকারের রোজগার বেশ ভালই ছিল, সেই রোজগার বন্ধ হলে রক্ষিতা বিলাসও বন্ধ হয়ে যাবে। আসামী তাই বেপরোয়া। সারা পৃথিবী মজে আছে কাম আর প্রেমে। অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, গৃহ রমণী। চাই শুধু চাই। বিজ্ঞাপনে কাম, সাহিত্যে কাম, ধর্মে কাম, সিনেমা থিয়েটারে কাম ? পোশাক পরিচ্ছদে কাম। সমস্ত মন পড়ে আছে দেহসঙ্গ বাসনায়। সমস্ত গ্রন্থি একই ধরনের বাসনায় টনটন করছে। ঘোর অসুস্থ এই সমাজ। সেই উদাহরণ এই খুনী বিশ্বনাথ সরকার।

ধর্মাবতার জীবনের বিনাশী পরিণতির কথা শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন,

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাত সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধহভিজায়াত ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

বিষয়ে আসক্তি, আসক্তি থেকে কাম, কাম প্রতিহত হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে বিবেকনাশ, বিবেকনাশ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, উচিত, অনুচিত বোধ লুপ্ত, বিচারবুদ্ধির লোপ মানেই বিনাশ। দি মোস্ট সাইকোলজিক্যাল একস্‌প্ল্যানেশান অফ ক্রাইম। এই পারভার্ট ওয়ার্লডের বলি আপনার সামনে, স্ত্রী হত্যাকারী বিশ্বনাথ সরকার। আইনের কাছে প্রার্থনা, চরম সাজার দৃষ্টান্ত রেখে ভবিষ্যৎ অপরাধের পথ বন্ধ করুন। অপরাধ প্রবণতাই মনের স্বাভাবিক ধর্ম। শাসন আর অনুশাসন ছাড়া মানুষ এক দ্বিপদ পশু।

পাবলিক প্রসিকিউটার বসলেন। উঠলেন আসামীপক্ষের বাঘা ব্যারিস্টার। কাঠগড়ায় সরলা চৌধুরী। খুব চুল মাথায়। ঘাড়ের কাছে চুবড়ির মতো খোঁপা। সাদা ব্লাউজ, সাদা শাড়ি। দীর্ঘ শরীর। স্বাস্থ্যের ঝিলিকে ঝকমক করছে। নাম, ধাম সব হয়ে যাওয়ার পর, শুরু হল সওয়াল :

ব্যারিস্টার : সরলা দেবী! আপনি বিধবা ?

সরলা : স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের যদি বিধবা বলা হয় তা হলে আমি

তাই।

ব্যা : তা হলে এত সেজেছেন কেন ?

স : আপনার মন ভোলাব বলে।

বাঘা ব্যারিস্টার থতমত খেয়ে গেলেন। আদালত কক্ষে গুঞ্জন উঠল। বিচারক বললেন অর্ডার অর্ডার। ভারতের নামকরা ব্যারিস্টার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে প্রশ্ন করলেন :

ব্যা : আই সে...

স : বাঙলা। ইংরিজি বুঝি না।

ব্যা : আপনি তেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন ?

স : আপনার মনে আছে দেখছি।

ব্যা : এটা কোর্ট, যা জিজ্ঞেস করছি এককথায় তার উত্তর দিন।

স : হাতে শাঁখা নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, তবু অবান্তর প্রশ্ন, আপনি বিধবা ? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বিধবাকে বিধবা বলতে নেই, তারা দুঃখ পায়।

দর্শকরা বললেন, বাঃ বাঃ। জজসাহেব বললেন, অর্ডার, অর্ডার।

ব্যা : তেরো বছর বয়সে পালিয়েছিলেন কেন ?

স : পালাব কেন ? উত্তর ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলুম। পালালে কেউ ফিরে আসে ?

ব্যা : সঙ্গে কে ছিল ?

স : সঙ্গে কিছু টাকা ছিল আর ছিল আমার সাহস।

ব্যা : সঙ্গে একটা ছেলে ছিল না ?

স : একটা কেন, অনেক ছেলে ছিল। ট্রেন ভর্তি ছেলে।

ব্যা : বিশেষ একজন। বয়সে বড়, দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় !

স : সঙ্গে যদি বয়স্ক আত্মীয়ই থাকল তা হলে পালানো বলছেন কেন ? পালানো আর বেড়ানো এক হল !

ব্যারিস্টার হোঁচট খেলেন। দু'বার গাউন ঠিক করলেন। সহকারীর দিকে একবার তাকালেন। সরলা চৌধুরী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বললেন,

স : যা বলবেন, ভেবে বলবেন।

ব্যা : [রেগে গেছেন] সেই আত্মীয়র সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল আপনার !

স : তেরো বছরেই অবৈধ !

ব্যা : আপনার বাড়ন্ত চেহারা ছিল।

স : বাড়ন্ত চেহারার কোনও মেয়ের বয়স্ক কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা অবৈধ। আমার জানা ছিল না। চেহারা ভাল হওয়াটা যে অপরাধ, এ কথাও তো আগে শুনিনি !

ব্যা : এটা কী ? [একটা পুরনো খবরের কাগজ]

স : পুরনো খবরের কাগজ।

ব্যা : এই ছবিটা কার ?

স : মনে হয় আমার কম বয়সের ছবি।

ব্যা : কেউ বেড়াতে গেলে, তার অভিভাবকরা, নিরুদ্দিষ্ট কলামে বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখেন না—সরলা, ফিরে এসো, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। মিঃ লর্ড [বিচারপতির দিকে তাকিয়ে] এই সরলা চৌধুরী তেরো বছর বয়েস থেকেই লুজ মর‍্যাল লাইফ লিড করায় অভ্যস্ত। সম্পর্কিত এক মামার প্রলোভনে বাড়ি ছেড়ে পালায়। তার ফলে তেরো বছর বয়সেই সরলা চৌধুরী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। গর্ভপাত করিয়ে সে-যাত্রা উদ্ধার পেতে হয়েছিল এঁর মাতা-পিতাকে।

স : গল্পের গরু গাছে ওঠে শুনেছি। তবে সে-গরু যে আদালতে থাকে আমার জানা ছিল না। আপনার বোধহয় জানা নেই আমি জন্ম বাঁজা। যে কারণে আমার বিয়ে দিতে মা-বাবাকে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছিল। আপনি যদি আমাকে একটি সন্তান উপহার দিতে পারেন, তা হলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। সন্তানহীনা মহিলার বেদনা আপনি বোঝেন ! আমাকে কলঙ্কিত মহিলা প্রমাণ করে আপনার লাভ ! হতভাগ্য এক নারীকে নিয়ে সাধারণের সামনে এই তামাশা নারীজাতির ওপর পুরুষের চিরকালের অত্যাচারের উদাহরণ।

আদালতে রব উঠল, ঠিক, ঠিক।

ব্যা : পাবলিক সেন্টিমেন্ট উস্কে চরিত্রের কলঙ্ক চাপা দেওয়া যায় না। গর্ভপাতের ফলেই আপনি বাঁজা হয়েছিলেন।

স : এ কথা আপনার চেয়ে একজন ডাক্তারই ভাল বলতে পারবেন। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে লাভ কী ! আমার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টই প্রমাণ করবে, আপনার সিদ্ধান্ত ভুল ও অপমানজনক। তা ছাড়া আমার স্বামী এতটা উদার ছিলেন না যে একজন কুলটাকে বিয়ে করবেন !

ব্যা : আপনার বাবা চাকরি করে দিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন।

স : এইবার আমি আর হাসি চাপতে পারছি না। ব্যারিস্টার হলেন কী

করে ! আমার স্বামী আমার বাবাকেই চাকরি করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। হাই ভোল্টেজ কারেন্টে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

সবাই বললেন, সাবাশ ! সাবাশ।

ব্যা : মি লর্ড ! আমি সরলা চৌধুরীর গৃহশিক্ষক বিনোদ বসুকে জেরা করতে চাই।

বিচারক : ইয়েস ইউ ক্যান।

বিনোদ বসু এজলাসে এলেন। প্রায় প্রৌঢ়। স্বাস্থ্য ভাল। চোখে চনমনে দৃষ্টি।

ব্যা : আপনি সরলা চৌধুরীকে পড়াতেন ?

বি : আজ্ঞে হ্যাঁ।

ব্যা : তখন সরলা চৌধুরীর বয়স কত হবে ?

বি : বারো, তেরো।

ব্যা : আপনার ?

বি : কুড়ি।

ব্যা : সরলা চৌধুরী কেমন মেয়ে ছিল ?

বি : ফ্লার্টিং টাইপ। গায়ে পড়া ধরনের। একবার মামার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। সে এক কেলেঙ্কারি। ফিরে আসার কয়েক মাস পরে সরলাকে নিয়ে সরলার মা বেশ কয়েক মাসের জন্যে বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। আত্মীয়স্বজনরা তখন বলেছিল—সরলার শরীর খারাপ। ধরন-ধারণ দেখে মনে হচ্ছে সরলা প্রেগনান্ট। ফিরে যখন এল, তখন খুব রোগা ও দুর্বল দেখাচ্ছিল।

ব্যা : তারপর আপনার কাছে পড়েছিল ? আর কি পড়িয়েছিলেন ?

বি : হ্যাঁ, এরপর আরও দু-তিন বছর পড়েছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দি। ভীষণ সেক্সি মেয়ে। পাড়ায় যথেষ্ট বদনাম। পাছে আমাকে বিপদে ফেলে দেয় তাই ছেড়ে দিয়েছিলুম। পরে দেখলুম ভালই করেছিলুম ; কারণ একের পর এক স্ক্যান্ডাল করে বেড়াতে লাগল মেয়েটা। আমাদের পাড়ার অনেককে ও নষ্ট করেছিল। সরলা চৌধুরী কিছু বলার আছে ?

স : বলার তো নেই। দেখাবার আছে। বিনোদের কীর্তিকাহিনী। গোটা পঁচিশ প্রেমপত্র আছে। অশ্লীল সব ইঙ্গিত। আর আছে আমার অঙ্কের খাতা—যে খাতায় ছবি এঁকে বিনোদ আমাকে বোঝাতে চাইত, নর-নারীর মিলন কাকে বলে ! এই হল সাক্ষী বিনোদ। এরপর বিনোদ তার পিসতুতো

বোনকে বিয়ে করে নিজেই এক কেচ্ছা বাধিয়ে বসল। সেই বিনোদের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের যথেষ্ট দাম আছে।

প্রসিকিউটার : ধর্মাবতার ! আমার লার্নেড ফ্রেন্ডের কেস তো দাঁড়াচ্ছে না। বারে বারে ফেঁসে যাচ্ছে। আসামীকে সওয়াল করার অনুমতি চাইছি।

ব্যা : মাই লার্নেড কলিগ অফ দি প্রফেসান—হি লাফস ওয়েল হু লাফস লাস্ট। ধর্মাবতার, আমি এখন তারক সরকারকে জেরা করার অনুমতি চাইছি।

বিচারক : ইয়েস গো অন।

তারক সরকার হাজির !

ব্যা : তোমার নাম ?

উত্তর : তারক সরকার।

ব্যা : বয়েস ?

উত্তর : প্রায় সতেরো।

ব্যা : তুমি এই মহিলাকে চেনো !

তা : হ্যাঁ চিনি !

ব্যা : কী ভাবে চেনো ?

তা : আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। আমি মাসী বলি। আমাকে খুব ভালবাসেন।

ব্যা : খুব ভালবাসেন, তাই না ? আদর-টাদর করেন ?

তা : যখন ছোট ছিলুম, এখন আমি বড় হয়ে গেছি।

ব্যা : যখন ছোট ছিলে তোমার মাসী তোমাকে আদর করবার সময় তোমার শরীরের কোন জায়গায় বেশি হাত দিতেন !

প্রসিকিউসান : অবজেকসান মি লর্ড। আমার লার্নেড মেম্বার ভালগারিটির দিকে চলে যাচ্ছেন। হি ইজ ফিশিং অ্যানসারস। আই অবজেক্ট।

ব্যা : মি লর্ড, আমার বন্ধুর ইরিটেসানের যথেষ্ট কারণ আছে। আমি এখুনি প্রমাণ করে দোবো, খুনী বিশ্বনাথ সরকার নয়। খুনী সরলা চৌধুরী অ্যান্ড তারক সরকার পার্টি। দিস ইজ এ সেকসচুয়াল ক্রাইম। প্রি-প্ল্যানড অ্যান্ড ওয়েলটাইমড়। এই সরলা চৌধুরী একটা সাইকোলজিক্যাল কেস। ওভার সেক্সড। সাফারিং ফ্রম বুল ফ্যাড। আউট অ্যান্ড আউট এ পারভার্ট। সরলা চৌধুরীর স্বামী ছিলেন সিকলি। স্ত্রীর লাস্ট স্যাটিসফাই করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সদা সর্বদা অদ্ভুত একটা হীনমন্যতা, একটা টেনসানে ভুগতেন। একদিন অন্যমনস্ক থাকার ফলে হাই ভোল্টেজ হ্যান্ডল করতে গিয়ে,

মেট হিজ এন্ড। মি লর্ড ! দ্যাটস এ মার্ডার। ইনডাইরেক্ট মার্ডার। সরলা চৌধুরী লাইকস টু বি রেপ্‌ড। বিশ্বনাথ সরকার তার পূর্বপরিচিত। একবার সদলে বিদেশ গিয়েছিলেন। চোদ্দ আগস্ট রাত্তিরে বিশ্বনাথ সরকারকে উত্তেজিত করার জন্যেই সরলা চৌধুরী চম্পা সরকারের বাড়িতে গিয়েছিল। মি লর্ড ইংরেজিতে বলে সেক্‌স থ্রো করা। সরলা চৌধুরী সেই ব্যাপারে এক্সপার্ট। পুরুষকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে আনন্দ পায়। বৈধর চেয়ে অবৈধ সম্পর্কেই তার উৎসাহ। নিজের ক্ষমতা সে পরীক্ষা করতে চায়। হার্ড বোলার। উইকেট ফেলাতেই তার তৃপ্তি। বিশ্বনাথ চৌধুরী ইনোসেন্ট ভিকটিম। মদের ঘোরে ছিল। আর তার পরিবারের ভূমিকাটা হল প্রতিশোধপরায়ণের। পাড়ার লোক জড়ো করে বেধড়ক পেটানো হল বিশ্বনাথকে। ঘটনাটা সরলা চৌধুরী ইচ্ছে করে ঘটাল এক কিশোরের সামনে। কারণ সে কামবিকৃতিতে ভুগছে। এইবার সে ছেলেটাকে গ্রাস করল। ছেলের বয়সী ছেলের সঙ্গে গড়ে তুলল যৌন সম্পর্ক। দিস কেস ইজ এ পারফেক্ট এগজাম্পল অফ প্যারাফিলিয়া। ছেলেটা সবে পিউবার্টি অ্যাটেন করছে সেই সময় এই ফ্যালিক ওম্যান তাকে বুল হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করল। তারক সরকার ওয়াজ একসপেল্‌ড ফ্রম স্কুল। লোকে কুকুর পোষে, ছাগল পোষে, সেই কায়দায় এই মহিলা ছেলেটিকে পুষতে লাগল টু স্যাটিসফাই হার লাস্ট, ডিজায়ার, ফর হার কারনাল প্লেজার। ছেলেটাকে ভাল-মন্দ খাইয়ে, মালাই আর সিদ্ধি দিয়ে তাগড়া করে তুলল ফর হার ইউস। দুম্বা তৈরি হল। সরলা চৌধুরী আপনি সিদ্ধি খান ?

স : হ্যাঁ খাই।

ব্যা . কেন খান ?

স : যে কারণে আপনি মদ খান। জীবনের ব্যর্থতা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকতে।

ব্যা : মি লর্ড সিদ্ধি হল অ্যাফ্রোডিসিয়াক, সেক্‌স স্টিমুলেন্ট। সন্ধের পর ছেলেটাকে গেলাস গেলাস খাওয়ানো হত, অ্যান্ড দ্য রিজন ইজ ওভিয়াস, টু মেক হাব বুল মোর পাওয়ারফুল। মোর পাওয়ারফুল র‍্যামরড।

প্রসিকিউসান : মি লর্ড, আমার লার্নেড ফ্রেন্ড, নিজের মক্কেলের স্বার্থে মেডিকেল ট্রুথকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন। সিদ্ধির অ্যাকটিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস হল, টেটরা হাইড্রো ক্যানাবিনলস, ইন শর্ট টি এইচ সি, সেক্‌স স্টিমুলেন্ট নয় সেক্‌স ডিপ্রেসেন্ট। যে-কারণে মহাদেব খেতেন, সাধু-সন্ন্যাসী,

কুস্তিগিররা খান ব্রহ্মচর্য রক্ষা করার জন্যে। সেন্ট্রাল-নার্ভাস-সিস্টেমের ওপর চেপে বসে। ইউফোরিয়া হয়, কামোত্তেজনা হয় না।

ব্যা : ইফ দ্যাট বি দ্য কেস, সরলা চৌধুরী সেইটাই চাইত। ছেলেটার সেল্‌ফ ডেস্ট্রয় করে দিয়ে, নিজের ইচ্ছেমতো ছেলেটাকে ব্যবহার করা, ফর ম্যাসোচিস্টিক প্লেজার।

তারক সরকার যাকে সবাই বলে তারক গুছাইত, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। একপাশে প্রসিকিউসান আর একপাশে ডিফেন্‌স। সামনে সরলা চৌধুরী। কিশোরীদা বলেছিল, সরলাকে ফাঁসা যদি বাঁচতে চাস। যতই হোক বাপ। বাপটাকে বাঁচা। সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছিল আমাকে। হঠাৎ মনে হল, অর্ধেক রাজত্ব আর বড়মাপের একটা রাজকন্যা আমার হাতে। রাজকন্যারও সম্পদের অভাব নেই। এক ঢিলে মারো দু'পাখি। বিশ্বনাথ সরকারকে না ফাঁসালে বাড়ি, জমি-জায়গা ডালিম এসে ভোগ করবে। সিনেমার নায়িকার মতো সরলা চৌধুরী আমাকে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম চারটেই দেবে। ধর্ম আর মোক্ষ কে চায়। অর্থ আর কামই সব।

ব্যা : *মি লর্ড ! ছেলের মা সেইদিন থেকেই বুঝতে পারলেন, ছেলে এক* বদমহিলার পাল্লায় পড়েছে, যেদিন ছেলে এসে বললে, তার লেখাপড়া গোল্লায় গেছে। তিনি বললেন, ওই ডাইনিটার ত্রিসীমানায় তুই যাবি না ! এই কথা সরলা চৌধুরীর কানে গেল। শুরু হল ছেলের অধিকার নিয়ে দুই মহিলার লড়াই। মি লর্ড আপনি জানেন—Hell hath no fury like a woman scorned. কিশোর প্রেমিক বয়স্কা প্রেমিকা সিদ্ধান্তে এল---পথের কাঁটা মাটিকে সরাতে হবে। কবে ! বিশ্বনাথ সরকার মাঝেমধ্যে আসে। কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। এইবার যেদিন আসবে, সেদিন চলে যাওয়ার পরই কাজ হাসিল করতে হবে। চশমাটা বিশ্বনাথ সরকারের, দড়িটা চম্পা সরকারের শায়ার দড়ি। বিশ্বনাথ সরকারই এনে দিয়েছিল। তারক সরকার তুমি ঘটনার রাতে সরলা চৌধুরীর ঘরে ছিলে। ছিলে তো !

তা : না, আমি কিশোরীদার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াচ্ছিলুম।

ব্যা : তুমি সেদিন সরলা চৌধুরীর বাড়িতে যাওনি ? গিয়ে, সিদ্ধি খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়োনি !

তা : না। একই সময় একজন দু'জায়গায় থাকতে পারে না।

ব্যা : প্রমাণ কী, তুমি ছিলে না !

তা : কিশোরীদা। আমি বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেখি আমার বাবা বিশ্বনাথ

সরকার চুলে যে গন্ধ তেল মাখেন, সেই উগ্র গন্ধ ঘরে ঘুরছে, মা মরে পড়ে আছে।

প্রসিকিউসান : সেই তেলের শিশি আমরা আসামীর ডেরা সার্চ করার সময় সিজ করে এনেছি। সাক্ষী সেই গন্ধ শনাক্ত করেছে।

ব্যা : গন্ধ শনাক্ত করা যায় না। স্মেল একটা পার্সোন্যাল ফ্যাক্টার, পার্সোন্যাল একস্‌পিরিয়েনস্‌। হাউ ক্যান ইউ প্রুভ, সাক্ষী মিথ্যে কথা বলছে না। ইফ আই সে দিস স্মেল ইজ নট দ্যাট স্মেল অর দেয়ার ওয়াজ নো স্মেল অ্যাট অল। কিম্বা সে পেয়েছিল চম্পা সরকারের মাথার তেলের গন্ধ। আমরা কংক্রিট, প্যালপেব্‌ল ট্রুথ চাই।

প্র : মাননীয় বিচারপতি, সাক্ষীর সাক্ষের তো তা হলে কোনও দরকারই থাকছে না, উইটনেস ফর প্রসিকিউসান শব্দটা বাতিল করে দেওয়া হোক। নতুন পদ্ধতির বিচার চালু হোক।

বিচারক : তারক সরকার কার সাক্ষী!

প্র : হি ইজ এ উইটনেস ফর প্রসিকিউসান। তারক সরকার মা, মা, করে অন্ধকার ঘরে ঢুকছে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে নাকে একটা তেলের গন্ধ পাচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট তেল।

বিচারক : তেলের গন্ধ ঘরে কতক্ষণ ঘুরতে পারে?

প্র : মি লর্ড দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ইনটেনসিটি অফ দ্য স্মেল, অন দ্য কন্ডিশান অফ দ্য প্লেস। ঘরের সব দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। দে ওয়্যার অন দ্য অ্যাক্‌ট অফ কয়টাস। নট ওনলি দ্যাট, মৃতার ভ্যাজাইনা থেকে সিমেন স্যাম্পল নিয়ে আসামীর সিমেনের সঙ্গে ম্যাচ করানো হয়েছে। স্পার্ম কাউন্ট সেম, এর পর আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। তেলের উগ্র গন্ধ, সিমেন ইন দি ভ্যাজাইনা, পিউবিক হেয়ার, সিল্ক কর্ড, চশমা।

ব্যা : তারক সরকারের সিমেন অ্যানালিসিস রিপোর্ট চাই।

প্র : আপনি কি বলতে চাইছেন?

ব্যা : এই সিদ্ধিখোর পাকা ছেলের মা-মাসী জ্ঞান নেই। ক্রিমিন্যাল হিস্ট্রিতে অজস্র ইনসেস্টের ঘটনা আছে। বাপ মেয়ের সঙ্গে, ছেলে মায়ের সঙ্গে, ভাই-বোনের সঙ্গে। এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি। তারক সরকারের পক্ষে তার মাকে মারার যুক্তি অনেক জোরালো। কারণ, সে সরলা চৌধুরীতে আসক্ত। একটা ইলিসিট ব্যাপারে লিপ্ত। এই মহিলা তাকে পুষছে, ফর এ পারপাস। সেকসচ্যুয়াল পারপাস। এই বয়সের একটা ছেলের কাছের সেক্‌স

কী জিনিস তা আমরা জানি। অ্যান্ড ফর সেক্স মার্ডার ইজ এ ন্যাচারাল এন্ড। এর ওপর আছে ড্রাগ অ্যাডিকসান।

দিনের পর দিন একই লড়াই। সরলামাসী সাংঘাতিক খেল দেখালেন। সরলামাসীকে লেখা বিশ্বনাথ সরকারের তিনখানা চিঠি আদালতে পড়া হল—সরলা, তোমার জন্যে আমি কি পাগল হয়ে যাব ! তোমার মতো অমন বুক, কোমর, পাছা আমি কারও দেখিনি। তোমার কোনও অভাব আমি রাখব না। খ্যাসকা, ধ্যাসকা, চম্পা আমার গলায় যেন পাথরের বোঝা। সরলা চলো আমরা কোথাও গিয়ে নতুন সংসার পাতি। তোমার অমন যৌবন হেলায় নষ্ট কোরো না। দু'দিনের এই পৃথিবীতে সুখের সন্ধান করা কি খুব অন্যায় হবে ! তোমার যা দরকার আমার তা আছে। বেশ বেশিই আছে। তোমার কোনও ধারণা নেই। তুমি যেমন খাইয়ে, আমি সেইরকম খাওয়াতে ভালবাসি। বিশ্বনাথ আমার নাম, ষাঁড় আমার বাহন।

তিনখানা চিঠি ও যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণে বিশ্বনাথ সরকারের যাবজ্জীবন হয়ে গেল। বিশ্বনাথ সরকার কোর্টে স্বীকারোক্তি করলেন—আমি আমার স্ত্রীকে খুন করিনি। খুন করেছি নিজের বিবেককে। মেয়েছেলে আমার কাছে মদের নেশার মতো। নিত্যনতুন শরীর চাই আমার। আমি জানি, এ এক কঠিন অসুখ। কঠিন অসুখেই তো মানুষ মরে।

॥ পাঁচ ॥

পাপ করলে তবেই মানুষের ভাগ্য ফেরে। এই টাকা, পয়সা, গাড়ি, বাড়ি, ভোগ-সুখ এ-সব শয়তানের সম্পত্তি। আমার আর এক গুরু, গ্রেট দালাল, ভানু বোস আমাকে বলেছিল, তারক সরকার কখনও পেছন দিকে তাকাবে না। যো হুয়া, সো হুয়া। সব মানুষেরই অতীত আছে। অতীতকে যে কবর দিতে পারে সেই সুখী। আর ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। চললে যেমন পথ ফুরোয়, বাঁচলে তেমনি কাল ফুরোয়। ভাল হতে চাইলেই ভাল হওয়া যায় না, খারাপ হতে চাইলেই খারাপ হওয়া যায় না। যে যা হয়ে আসে, সেইভাবেই চলে যায়। জীবন হল আখ। নিঙড়ে নিঙড়ে শেষ বিন্দু রস বের করে নাও।

ভানু বোস চোখে মুখে কথা বলে। যখন যেমন, তখন তেমন, যার কাছে

যেমন তার কাছে তেমন। একদিন দেখি, খুব তিলক সেবা করেছে, গলায় তুলসীর মালা।

—দীক্ষা নিলে ?

—চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে।

—তার মানে ?

—মানে, বেশ বড় একটা দাঁও মারতে যাচ্ছি। যার কাছে যাচ্ছি সে হল ঘোর বৈষ্ণব। জয় ঠাকুর, বলে দাঁড়াব গিয়ে, কথার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দোবো, সবই প্রভুর ইচ্ছে, কাজ হাসিল। বাড়ি তৈরির সময় ইট গাঁথা দেখেছ— একটা ইট, খানিকটা মশলা, আবার একটা ইট। সব প্রভুর ইচ্ছে, সেই মশলা। বিষয় কথা হল থান ইট। তিন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। তিনজনেরই অনেক চেলা। সব ধর্মেই আমার গাদা গাদা গুরু ভাই। কারও ফ্ল্যাট চাই, কারও গাড়ি, কারও পাম্প। কেউ বেচবে, কেউ কিনবে, মাঝখানে ভানু বোস। জয় প্রভু, জয় ঠাকুর। ফ্রাই ইওর ফিশ ইন ফিশ অয়েল। জগতের দিকে তাকাবে শিকারীর চোখে। উদ্দেশ্য একটাই, কাকে বধ করা যায়। এ কী রকম জানো— ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব, রোটারি ক্লাবের মেম্বার হওয়ার মতো। জাল কাঁধে ঘোরো, জবরদস্ত মাছ দেখলেই ঝপাত করে ছোঁড়ো।

এই ভানু বোসের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল কিশোরীদা। ভানু বোস এস্কিমোদের দেশে গিয়ে ফ্রিজ বিক্রি করতে পারে। সাহারা মরুভূমিতে টিকে। লোকটাকে কপি করো, জীবনে উন্নতি হবে। ভানু বোস বলেছিল— শোনো ছোকরা— একটা ছবি সব সময় চোখের সামনে দেখবে— এক বুড়ি, একটা চরকা আর তুলো। ঘাড় গুঁজে চরকা ঘুরিয়ে যাচ্ছে, তুলো সুতো হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে চাকায়। ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই, নিজের চরকায় তুলো দাও।

ঝড় চলে গেল। বাড়িটা ভূতের বাড়ি হল। রোজই মাকে দেখতে পাই। ভাল অবস্থার বিশ্বনাথ সরকারকে মনে পড়ে। বারান্দার চালায় লাউগাছ লতাচ্ছে। কিশোরীদার গ্যারেজের প্রথম দিনেই আচমকা এক লাথি নিতম্বে। গ্রীজ, মোবিল, জল কতকতে মেঝেতে গড়াগড়ি। বললে— দীক্ষা হল। চরিত্রে কালি না মাখলে জগৎ চেনা যায় না। সর্বাঙ্গে কালি না মাখলে মটোর মেকানিক হওয়া যায় না। সন্ধেবেলা বোতল, ছোলা আর পেঁয়াজ নিয়ে বসবি, সারাদিন হাড় ভাঙা খাটবি। ইঞ্জিনের সঙ্গে কথা বলবি খিস্তির ল্যাঙ্গোয়েজে। পৃথিবীর অনেক জিনিস খিস্তিতে চলে। মানুষের মধ্যেও এইরকম আছে,

যাদের বলা হয়, কী জিনিস মাইরি, ডাইনে যেতে বাঁয়ে যায়। কখনও ঝেড়ে কাশে না। পেটে আদ্দেক মুখে আদ্দেক। প্রথমে ফাইফরমাশ খাট। এটা ওটা নিয়ে আয়, যন্ত্রপাতি, পার্টস চেন, তারপর হাত লাগাবি ইঞ্জিনে, ওয়ারিং-এ। মটোর গাড়ি তোমার দেহ নয়, এর অনেক হ্যাপা। দুটো চোখ, দুটো কান, একজোড়া হাত আর পা, একটা ডাম্বেল, একটা বারবেল, মানুষ ফিনিশ। গাড়ির ? কারবুরেটার, ইগনিশান কয়েল, হোস, স্টার্টার, জাম্পার কেব্‌ল টার্মিনাল, অ্যাস্‌কল, যত এগোবি ততই নয়া নয়া চিজ পাবি।

হাতল ভাঙা কাপে চা, থেকে থেকে সিগারেট, কখনও গাড়ির বনেটে, কখনও গাড়ির তলায়। আর আমরা তিনটে ছেলে। আসল নাম লোপাট। আমাদের গ্যারেজের নাম— জগাই, মাধাই, নিতাই। আমি জগাই। একজন হিসেববাবু আছেন, তিরিক্ষি চেহারা। সব সময় হিসেবী কথা। কেউ কিছু চাইলেই প্রথম প্রশ্ন— কেন, কী হবে ! তবে খুব কড়া হিসেব। খাতায় না লিখে একটা পয়সাও ছাড়েন না। কিশোরীদা নাম রেখেছে, চিত্রগুপ্ত। কথায় বলে, খোঁড়ার পা-ই গর্তে পড়ে। যার যেমন বরাত ! হলটা কী ? আবার কেচ্ছা। চিত্রগুপ্তদার একটি মেয়ে ছিল। একটিই মাত্র মেয়ে। তখন আবার বাজারের হিটগান জল ভরো কাঞ্চন কন্যা জলে দিয়া মন। সেই কাঞ্চন কন্যা। ভাবাই যায় না, অমন বাপের অমন সুন্দর মেয়ে হতে পারে ! বয়েস বারো, তেরো। পিঠে ঝুলছে চওড়া, মোটা বিনুনি। সুন্দর একটা ফ্রক। সরু কোমর। ভারী পাছা। মোমের মতো পা দুটো। দুর্গা ঠাকুরের মতো মুখ। চিত্রগুপ্তদাকে দুপুরে খাবার দিতে আসত। আয় মা, আয় মা, বলে, চিত্রগুপ্তদা যেন দেবী দুর্গাকেই আবাহন করছেন।

কিশোরীদার কাশীর পেয়ারা গাছের ডালে বসে হনুমানের মতো পেয়ারা চিবোচ্ছিলুম। মেয়েটিকে প্রথম দেখা মাত্রই হাত থেকে পেয়ারা পড়ে গেল। ভাগ্য ভাল মাথায় পড়েনি। তাহলেই আমার যে রেপুটেশান— কিশোরীদা মুখে করে জুতো বইয়ে ছাড়ত। সেই প্রথম মনে হল, মেয়েরা কত সুন্দর ! কত শান্তি ! কত নির্ভরতা ! গাছের মতো, ফুলের মতো, ঘাসের মতো। মনে আমার কোনও কুভাব এল না। গাছের ডালে বসে চোখে জল এসে গেল। এত সুন্দর জীবন নষ্ট করে ফেললুম ! আমার সেই স্কুল, বাগান, ক্লাস, ব্ল্যাকবোর্ড। কলেজে যেতে পারতুম, বন্ধু-বান্ধব, ঘাস-সবুজ মাঠ। খেলাধুলো গান গল্প। এইরকম একটা মেয়ের বন্ধুত্ব। সব গেল। এরই নাম বরাত।

ভানু বোস, দালাল দি গ্রেট, আমাকে বলেছিল, ভায়া ! শুরুতে জীবনটাকে

ওইরকম মনে হয়। কত সুন্দর ! স্কুলে আবৃত্তি করতুম রবীন্দ্রনাথ :

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কানের কাছে হেঁড়ে গলায় সংসার বললে, ভানু বোস, ফুলবাগানে কোয়েল বোলে আর কৌয়া বোলে টিনের চালে। প্রাণ তো আছে, তবে প্রাণের কল চালাচ্ছে উদরের ইঞ্জিন। অতএব উদরের ঔদার্যের জন্যে ফিল্ডে নেমে পড়ো। সেখানে ছুটছে ঘোড়া, ছুটছে গাধা, ছাগল, ভেড়ার পাল। নো কবিত ভায়া, সবই নিদারুণ প্রবন্ধ। সেখানে ঘুরছে চাকা ঘসর ঘসর, পিষছে মানুষ কায়দা হল বাঁচা, সকাল বিকেল কুইক মার্চ, ডন বৈঠক, হাতের কাজ। জীবনের বাইরে পড়ে আছে প্রেম, আলো, গান। জীবনে প্রেম নেই বিয়ে আছে। নারকোল গাছের পাতায় কত কাব্য। শুকোলেই খ্যাংরা। বিয়ে হল প্রেমের খ্যাংরা। ওসব নিয়ে অত আফশোস কোরো না। তোমার বাপের তে উইণ্ড মিল নেই। থাকলে ঘাস, চাঁদ, লতাপাতা, কবিরাজী করতে পারতে। এখন যা তোমাকে করতে হবে, তা হল দুরমুশ। আমার একবার একটা প্রেম হয়েছিল ; অবশ্যই ছাত্রজীবনে। ওই যেমন চিকেন পক্স, হুপিং কাফ হয় সেইরকম আর কী ! একটু চেষ্টা করতেই হয়ে গেল। এ তো প্রেমের দেশ। প্রথম তিন দিন যাবতীয় ন্যাকা ন্যাকা কথা। চতুর্থদিনে বেশ নির্জনে একটু হাঁটিং কাম মিটিং। সেই চাঁদ-তারা-লতা-পাতা-কচু-ঘেঁচু দিয়ে শুরু হল, তিন মিনিটের মধ্যে ব্যাপারটা হর্টিকালচার থেকে ফিজিক্যাল কালচারের দিকে চলে গেল। শোনো ভায়া দেহ ছাড়া নাই কিছু। দেহহীন মানে ভূত। ভূতেদের সেই জন্যে ফিজিক্যাল কালচার নেই, শুধু ভয়েস কালচার— এই কোথায় যাচ্ছিস। নেতাদের মতো এক মাইল, দেড় মাইল লেকচার শুধু লেকচার। জীবনটা কী— লেড়ো বিস্কুট। যতক্ষণ তোমার দাঁত আছে কুড়ুর মুড়ুর চিবিয়ে খাও। দাঁত মানে তোমার যৌবন, তোমার রোজগারের ক্ষমতা। গোল চাকতির জগৎ, সিলভার লাইনিং ; বাকি সব ফালতু। নাকে কাঁদার জায়গা

এটা নয়। যার মুরোদ নেই, সে মুরুব্বি ধরে ভগবানকে। তিনি দুঃখ ছাড়া কারোকে কখনও কিছু দেননি। কারণ তিনি আকাশ, তিনি বাতাস, তিনি অনন্ত, পদ-হস্ত বর্জিত জগন্নাথ। মহিমা ছাড়া তাঁর কিছুই নেই। যাঁরা ভগবানের মহিমা শোনান, তাঁদের পথ্য হল সন্দেশ, ক্ষীর-ছানা-মালপো-মালাই। আর যাঁরা শোনেন তাঁদের ছাতু। যখন দাঁত যাবে, তখন তাঁকে ধোরো। সহ্যশক্তি বাড়বে। যদ্দিন দাঁত আছে কড়র মড়ব চিবিয়ে খাও। বৃদ্ধের ভগবান, যৌবনের শয়তান। শুধু দেখবে যা করছ, তাতে তোমার লাভ হচ্ছে কি না! দুটো শব্দ, লাভ আর লোকসান। লাভের দিকে থাকার চেষ্টা করবে। LOVE -এ যদি লাভ হয় তাহলে অলরাইট। পেঁয়াজ ছাড়ানো প্রেম কোরো না, খোসা ছাড়িয়েই গেলে, শেষে ফক্কা।

ভানু বোস ভোলাতে চাইলে কী হবে, মেয়েটা দাগা মেরে গেছে। পৃথিবীর ভেতর আর একটা পৃথিবী আছে আমরা ধরেও ধরতে পারি না। নদীর গান, ঝরনার নাচ, চাঁদের আলোর রেশমী শাল, সবুজে সোনা রোদ্দুরের অভ্র চূর্ণ, ফর্সা কপালে লাল টিপ, গোল হাতে সোনার কাঁকন, নীল আকাশের কোলে সমুদ্রের ঢেউ— বালকের লাফালাফি, এসব কী একেবারেই অর্থহীন। এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছে ফুলের মাথায়। যখন রবীন্দ্রনাথের ওই গান কানে আসে মনটা কেমন হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় একটা কোলা ব্যাং—

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে।।
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল—
কোথা সে পথের শেষ কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে।।

পেয়ারা গাছের ডাল থেকে নেমে এলুম। নীল ফ্রক পরা সেই মেয়েটি চলেছে। টিফিন কেরিয়ার এক হাতে দুলছে। মাধাই পেছন থেকে এসে কাঁধে আলতো হাত রেখে বললে— ওস্তাদ! একদম কুনজর দেবে না, বস জানতে পারলে ওপর নীচ দু'পাটিই খুলে নেবে। সে তো জানি, তবু প্রাণ করে আনচান। আমার নাম তারক সরকার, লোকে আমাকে গুছাইত বলে। মনে ধরলে সহজে আমি ছাড়ি না। শেষ পর্যন্ত আমি খাবই। চিত্রগুপ্তদার খেঁকুরে চেহারার কারণ, দিশি মাল। আমার মতোই কেস। সঙ্গদোষ, শাসনের অভাব। গামছা মুড়ে লুকিয়ে দাদাকে রোজ একটা করে বোতল সাপ্লাই করতে লাগলুম। মহা খুশি। তোমার মতো ছেলে হয় না গো। দাদা গলছেন।

মালের সঙ্গে টাল দিয়ে দাদাকে একেবারে টাল খাইয়ে দিলুম। দাদার বাড়িতে যাওয়ার পথ খুলে গেল। বউদি একেবারে মাটির মানুষ। মুখ দেখে মন পড়ার ক্ষমতা নেই। আমি আবার গিরগিটির মতো রঙ পালটাতে পারি। মুখ নির্বোধের মতো, চোখ ফ্যালফ্যালে। মেয়েরা এইরকম শিশু শিশু ভাব ভীষণ পছন্দ করে। মেয়েটির নাম, অনুরাধা। স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। ব্যাপারটা যখন বেশ এগিয়েছে। যখন ভাবছি, একদিন দু'জনে কেটে পড়ব, সুদুর কোনও নদীর ধারে। স্বপ্ন দিয়ে একখানি ঘর বাঁধব ভালবেসে। প্রেমের মঞ্জিল। কিশোরীদা ঠেসে একটা চড় কষিয়ে বললে— শালা! যেখানে সেখানে হাত! তাজমহলে আলকাতরা মাখাতে গেছ। ওর জন্যে আমার ছেলে ঠিক করা আছে। ওখানে ওস্তাদি করতে যেও না। মেরে লাশ করে দোবো। কিশোরীদার সাক্ষীর জোরে হাজতবাস থেকে বেঁচেছি। গাড়ির কাজকর্ম ভালই শিখছি। কিশোরীদা বললে, মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা কর। পেটিকোটম্যান হোসনি। শুদ্ধ প্রেম তোর ধাতে সইবে না। তোর ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে গেছে। হাঁড়ি থেকে কলসী হয় না, আবার মাটিতে ফিরে যেতে হয়।

অনেক ভেবেছি। নর্দমা থেকে উঠে ধবধবে সাদা চাদর পাতা বিছানায় যাওয়া যায় না। সরলামাসীর সঙ্গে আমার মেলামেশাটা যে নির্দোষ নয় তা অনেকেই বলতে শুরু করেছে। মুখরোচক, মুচমুচে কাহিনী ঘরে ঘরে ঘুরছে। পাড়া থেকে তুলে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। পারছে না কিশোরীদার দাপটে। তারক সরকার খারাপ, বদ, লোচ্চা একেবারে ছাপ মারা হয়ে গেছে। ক্ষমতা নেই বেরিয়ে আসার। যেমন একজন বারবণিতা সুস্থজীবনে ফিরতে পারে না। কিশোরীদা বললে, তোর সামনে দুটো পথ। হয় বিশাল বড় লোক হয়ে যাওয়া, নয় আমার ডেরায় থেকে মন-প্রাণ লড়িয়ে কাজে ডুবে যাওয়া। তৃতীয় পথও আছে, নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করা। তিন কাঠা জমির ওপর একতলা বাড়ি। তারক সরকার সহজে যেতে পারে কোথাও! সরলা মাসীর সম্পত্তিও হয় তো বরাতে নাচছে। এত সেবা করলুম তার পুরস্কার কি পাব না! মহিলার তো কেউ কোথাও নেই আমি ছাড়া।

গাড়ির ইঞ্জিনের প্রেমে পড়ে গেলুম। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকছি। চালানোটাও শিখে গেছি। এইবার লাইসেন্সটা হলেই হয়। তখন আমি একাই দেশ-দেশান্তরে ঘুরব। গাড়ির অভাব নেই গ্যারাজে। মেরামতের সময় ইঞ্জিন চালু করে দিয়ে কিশোরীদা বলে— জগা, শব্দ শুনে বল, ট্রাবলটা কোথায়! গাড়ির লাইনে কান একটা মস্ত জিনিস। আগে কানে শুনবি,

তারপর চোখে দেখবি। ডাক্তার স্টেথিসকোপ দিয়ে আগে বুক পরীক্ষা করে। হৃদয়ের শব্দ শোনে। ফুসফুসে শোনা বাতাসের বাঁশি। জিজ্ঞেস করে, খিদে কেমন ? ইঞ্জিন তুমি তেল কি বেশি টানছো ! তাহলে তোমার শরীরের টিউনিং ঠিক নেই বাছা ! ইঞ্জিন চালিয়ে শব্দ শোন।

সামনেই একটা গাড়ি ছিল। কিশোরীদা লাফিয়ে উঠে স্টার্ট দিলে। একবার সামনে এগলো, একবার পেছনে। এক জায়গায় দাঁড়াল। ইঞ্জিন বন্ধ করল না— জগা, এদিকে আয়, শব্দ শুনে বল ?

কিশোরীদা আমাকে শিখিয়েছিল, গাড়ি চলছে না ; কিন্তু ইঞ্জিন চলছে, তখন যদি শব্দ শুনিস, বুঝবি গড়বড়িটা ইঞ্জিনে। হয় কোনও বেল্টে, না হয় এগজস্টে।

—কিশোরীদা, গোলমালটা এগজস্টে।

—শালা ! বলেছিস ঠিক। অল্প দিনেই পেকে গেলি। এলেম আছে। আয়, উঠে আয়, একটা রাউণ্ড মেরে আসি।

কিশোরীদা বাঘের বাচ্চার মতো গাড়ি চালায়। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে। স্টাইলে ঘোরায়। যেন বাজনা বাজাচ্ছে।

—আর একটা শব্দ পাচ্ছিস ?

—পাচ্ছি। পিং।

—শালা ! গুরু মারা চেলা। তোর অনারে আজ দু'পেগ বেশি খাব। পিং কেন হয় !

—ইননিসান টাইমিং অ্যাডভানস কন্ট্রোলে গোলমাল আছে। ইজিআর ভালভে কোনও গণ্ডগোল থাকতে পারে।

—সাবাশ ! চল আজ তোকে পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াব। আজ তোর ডে অফ ডেকরেশান। কেউ কিছু শিখলে কী যে আনন্দ হয় ! জেনে রাখ জগা— পৃথিবীর একটা সত্যই সত্য- সেটা হল শিক্ষা। একটা সম্পর্কই সম্পর্ক গুরু-শিষ্য সম্পর্ক।

আরও কিছুটা ঘোরার পর কিশোরীদা বললে, চল, আমার সেই প্রেমিকার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। অনেকদিন যোগাযোগ করিনি, হয় তো অভিমান করেছে। ভাল প্যাস্ট্রি কিছু কিনে নিয়ে যাই, একটা মদ আর ফুল। ওমর খৈয়ামের মতো। কবির মতো, কবিতার মতো।

—বিয়েটা করবে কবে ?

—শীতটা আর একটু জমুক। তারপর বিয়েটা জমাব।

—তুমি কি বিয়ের কথা বলেছ্।

—আমি তোমাকে বিয়ে করব, এই ভাবে কেউ বলে না কী ? বলতে হয় তোমার জীবনের দায়িত্ব আমি নিলুম। তোমার পাশে আমি আছি। কায়দা করে বলতে হয় । সেই ভাবে বলে এসেছি।

ফুল, ফল, বোতল, কেক, সব নিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল সেই অভিনেত্রীর বাড়ির সামনে। কিশোরীদার চোখ-মুখ একটু লালচে দেখাচ্ছে। আর তো পাওনাদার নয়, আজ সে প্রেমিক। আমার হাতে বাস্কেট। বাস্কেটে সাজানো সব জিনিস। ফুল লটর পটর। কিশোরীদা কলিংবেল টিপছে। তিন চারবারের পর এক বৃদ্ধা দরজা খুললেন— কী চাই ?

—মাধুরীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—মাধুরী বোম্বাই চলে গেছে।

—বোম্বাই গেছে কেন ?

—ছবির কাজে।

—ছবির কাজে। ছবি করবেন না বলেছিলেন।

—আপনি কে ? ডিরেক্টার ?

—আমি গাড়ির মিস্ত্রী।

—সে গাড়ি তো বিক্রি করে দিয়েছে।

—আপনি কে ?

—আমি তার শাশুড়ি।

কিশোরীদা আমার দিকে ফিরে বলল— অ্যাবাউট টার্ন। কুইক মার্চ।

অনেকটা পথ কোনও কথা না বলে কিশোরীদা গাড়ি চালিয়ে এল। কোথায় যাচ্ছে, জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছে না। গুম মেরে আছে। হঠাৎ নিজেই বললে— জানিস যারা অভিনয় করে, তারা পর্দার বাইরেও অভিনয় করে। তাদের জীবনটাই অভিনয়ের। একে কি বলে জানিস— গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া। হাই সোসাইটির মেয়েদের কখনও বিশ্বাস করবি না।

—বুঝেছি।

—বিয়ে করলে, সব সময় সাধারণ ঘর থেকে মেয়ে আনবি। তারা কোনও দিন তোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ছত্রিশবার স্বামী পাল্টাবে না। সবচেয়ে ভাল বিয়ে না করা।

—বুঝেছি।

—সে তো আমিও বুঝেছিলুম। বুঝেও ফাঁদে পা দিয়েছিলুম। মোহিনী

মায়া। মহিষাসুর মা দুর্গাকে বলেছিলেন, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো মা, এই নাও আমার বুক। আমি নিহত হতে চাই। তা না হলে, এখুনি আমি বলব, এসো আমার বিছানায়। আমরা সব অসুরের জাত। যতক্ষণ না মরছি ততক্ষণ নারীর মোহ ঘুচবে না। বলব এক, করব আর এক।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ওল্ড এজ হোমের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। পরিচ্ছন্ন, সুন্দর একটা বাড়ি।' রাস্তা থেকেই দোতলার বারান্দা দেখা যাচ্ছে। দু তিনটে খালি ইজিচেয়ার পাতা। এক বৃদ্ধ সামনে কুঁজো হয়ে পায়চারি করছেন। ঢোলা প্যান্ট, ডোরাকাটা জামা গায়ে।

—এখানে কী করবে ?

—ফুল, কেক আর বোতলটা উপহার দিয়ে যাই। কত খুশি হবে। মাঝে মাঝে আমি উপহার দিয়ে যাই। একদল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জীবনের সব কাজ শেষ করে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছে। নে সব নামা।

কিশোরীদা আগে আগে, আমি পেছনে মালপত্র নিয়ে। পরিষ্কার উঠন পেরিয়ে অফিস ঘর। সেখানে একজন মিষ্টি চেহারার নান, টেবিলে বসে আছেন। সন্ন্যাসিনী কিশোরীদাকে চেনেন। ভাঙা বাংলায় বললেন— গ্রেটম্যান, আজ পিটারের জন্মদিন। তোমার উপহার পেয়ে সে খুব খুশি হবে। তাকে ডেকে পাঠাই। পিটার এলেন, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। একসময় খুব শক্ত সমর্থ চেহারা ছিল। শরীরের ফ্রেম দেখলেই বোঝা যায়।

—আই ওয়াজ ইন দ্য আর্মি জেন্টলম্যান, নাও আই অ্যাম অ্যান ওল্ড রেক।

উপহার পেয়ে বৃদ্ধ খুব খুশি। কিশোরীদা ডোনেশান দিলেন কিছু। সন্ন্যাসিনী একটা লাল গোলাপ দিলেন কিশোরীদার হাতে। আমরা বেরিয়ে এলুম। আবার গাড়ি চলল। কিশোরীদা এইবার গান ধরেছেন— এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি, সব সত্যি।

—একটা কথা জেনে রাখ জগা, ভাল কাজে মনটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। চেষ্টা করবি কিছু কিছু ভাল কাজ করার। মনে কর ভাল কাজ করাটাই মানবধর্ম।

আমি তারক সরকার লোকে আমাকে গুছাইত বলে। আমার জীবনের সবটা না জেনেই বলে। কোনও ভাল কাজ করিনি, তা কি হতে পারে ! সরলা মাসী একদিন সকালে আবিষ্কার করলেন, চলতে গিয়ে পা এলোমেলো পড়ছে। যেদিকে ফেলতে চাইছেন, পড়ছে তার বিপরীত দিকে। দৃষ্টি

ঝাপসা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। শুয়ে-বসে শান্তি নেই। নায়িকার মতো যার শরীর তার এ কী দুর্দশা। ডাক্তারবাবু এলেন, দেখলেন। বাইরে এসে আমাকে চাপা গলায় বললেন, খুবই দুঃখের কথা, মনে হচ্ছে ব্রেন টিউমার। মাথাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করাও।

আমি পালিয়ে যেতে পারতুম, অস্বীকার করতে পারতুম আমার দায়িত্ব। যা ফুর্তি তা তো লোটা হয়েই গেছে। টাকা পয়সা যা বাগাবার বাগিয়ে নিয়েছি। এইবার নিজে নিজে মরুক না। পাপী তো। পাপীরা তো কষ্ট পেয়েই মরবে। সেইরকমই তো বিধান ঈশ্বরের। আমি তা পারিনি। সরলাকে আমি ভালবেসে ছিলুম। বয়সের বিরাট তফাত সত্ত্বেও। মানুষ যা বলে বলুক। মনের বয়স নেই। আমাদের হাতে যা ছিল সেইটাই আমরা নাড়াচাড়া করেছি, ভোগ করেছি। ভোগের আর দুর্ভোগের, দুটোরই কোনও বয়েস নেই।

আমার কিশোরীদা, অগতির গতি। সরলামাসীকে নিয়ে স্পেস্যালিস্টের কাছে। দেখে পরীক্ষা করে বললেন, ব্রেন টিউমার। অপারেশন খুব কঠিন কাজ। বাঁচা-মরা ঈশ্বরের হাত। সরলামাসী বললে, আমাকে মরতে দাও। আর কদিন। একটা কাজ তোমার কিশোরীদাকে দিয়ে করিয়ে নাও। একজন উকিল, আমার যা আছে সব তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ। আমার আর দেওয়ার কিছু নেই।

গুছিয়ে নিতে পারি বলেই আমার নাম গুছাইত। তবু এই পাওয়াটা আমার কাছে স্মৃতি আগলানোর মতো। যে ঘরে, যে বিছানায় আমাদের রাত কাটত, সেই বিছানায় দীর্ঘ রেখার মতো পড়ে আছে সরলামাসী। আলো সহ্য করতে পারছে না বলে জানলায় ভারী পর্দা। চোখ দুটো ক্রমশই ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এক ধরনের দুষ্টু দুষ্টু চোখ ছিল সরলামাসীর। রাতের দিকে জ্বলজ্বল করত। সেই চোখ আগুনের ঢেলার মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। অসহ্য যন্ত্রণার বিন্দু বিন্দু ঘাম অনবরতই ফুটছে কপালে। নরম ন্যাকড়া দিয়ে মুছিয়ে দি। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে তখন আমার হাত দুটো শক্ত করে ধরে সহ্য করার চেষ্টা করে। শরীরের সবই ঠিক আছে, কেবল চুলে ভরা মাথাটার মধ্যেই অদৃশ্য এক গোলোযোগ। এর কোনও ওষুধ নেই। একটাই ওষুধ— সহ্য করা। বেডপ্যান আমি নিজেই লাগাই। নিজেই পরিষ্কার করি। রাত যখন গভীর হয়ে কালো থকথকে হয়ে যায়, মানুষ যখন ঘুমের অতলে অচৈতন্য, আমি শুনি হাপরের মতো নিঃশ্বাসের শব্দ। ভোগ ভাগ করা যায়, দুর্ভোগ একা একা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। পূর্বজন্ম বলে যদি কিছু

থাকে তাহলে সরলামাসী নিশ্চয় আমার কেউ ছিল। সেই রাত আর এই রাত। সে রাতে এক কিশোর এই শরীরের দিকে তাকিয়েছিল তার নতুন জেগে ওঠা কৌতূহলের দৃষ্টিতে। তার ভেতরে তখন এক পুরুষের ঘুম ভাঙছিল। এই রাতে এক যুবক অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে এই পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজনের দিকে, যে ছিল তার প্রেমিকা। আদালতে এক বাঘা ব্যারিস্টারকে যে ঘায়েল করে দিয়েছিল, নিজের বুদ্ধিতে, তীক্ষ্ণতায়, তেজে। ভালবাসার মতো অজস্র উপাদান ছিল এই শরীরে। বেঁচে থাকার গরম মশলা। যাও, তুমি যাও, তোমার যন্ত্রণাটা আমাকে দিয়ে যাও!

শেষটা এল শেষ রাতে। রাত যখন দিনে গিয়ে মিশছে। পৃথিবী যখন জাগছে, তখন একজন ঘুমিয়ে পড়ল। যে-ঘুম কখনও ভাঙে না। কিছু একটা বলার ছিল, বলা হল না। একটা হাত ধরার ছিল ধরা গেল না। মৃত্যুর পরই রূপ যেন আরও খুলে গেল। রঙটা কালচে হয়ে গিয়েছিল, সেটা আরও ফুটে উঠল। যন্ত্রণার অবসানে মুখ প্রশান্ত। সবচেয়ে প্রিয় সিল্কের শাড়িটা পরিয়ে দিলুম। বেশ করে সাজালুম, যেন পুতুল সাজাচ্ছি। একবার মনে হল, সিঁথিতে একটু সিঁদুর ছুঁইয়ে দি। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। কিশোরীদা বললে—চল, আমরা চারজনে নিয়ে যাই। আর কেউ কাঁধ দেবে না। জগাই মাধাই, নিতাই, কিশোরী, সঙ্গে চলেছে আমাদের পাড়ার ভানুপাগল—সে গাইছে ভবাপাগলার গান, বারে বারে আর আসা হবে না। পথের একপাশ দিয়ে কারোকে বিরক্ত না করে চলে গেলেন সরলামাসী। একটা মানুষ অনেক মানুষের মধ্যে বাঁচে না। একজন-দু'জনের মধ্যে বেঁচে থাকে। পুড়ে গেল দেহ। পাগলের সেই গান আজও আমার মনে আছে :

বারে বারে আর আসা হবে না,
মানুষ জনম তো আর পাবে না।
ভেবেছ মনে, এই ভুবনে,
তুমি যাহা করে গেলে, কেউ জানে না ॥
তুমি যাহা করে গেলে, আসিয়া হেথায়,
চিত্রগুপ্ত লিখে ভরিল খাতায় ॥
বিচার করিবেন, ওই বিধাতা,
ফাঁকি ঝুঁকি তাঁর কাছে কিছু চলে না ॥

আমার গুরু ভানু বোস বলেছিল, সব সময় হিসেব করবে, যদি লাভ হয়, তাহলে ঠিক করেছ। যদি লোকসান হয় তাহলে ভুল করেছ। দুটো কাজে

আমি সেই হিসেবে ঠিকই করেছি, এক নম্বর, পিতা বিশ্বনাথ সরকারকে ঝুলিয়ে দেওয়া, দুই সরলামাসীর খেলায় খেলুড়ে হওয়া। একেবারে নিট্ লাভ। পাড়ার লোকের টনক নড়ে গেল। একটা ছেলে, বদ শয়তান ছেলে, দু'দুটো সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। আমার জাতভায়েরা একটা জিনিস খুব বোঝে, সেটা হল সম্পত্তি।

কিশোরীদা বললে, স্ত্রী আর সম্পত্তি, এ দুটো জিনিস থাকা ভাল, তবে আয় দেয় না, সার্ভিস দেয়। মটোর গাড়ির মতো। গাড়ি, বাড়ি, স্ত্রী। রোজগারের, ক্যাশ রোজগারের ধান্দাটা রেখে যেও। সেটা আসবে তোমার গতর থেকে। তোমার বুদ্ধি থেকে। ওড়ালে, বিষয়সম্পত্তি তিন রাত্তিরে উড়ে যাবে। খুব সাবধান।

সাবধান তো বটেই। উড়তে চাইলে পরের ডানায় উড়ব। নিজের ডানা ব্যাঙ্কে থাকবে।

মাঝে মাঝে মনে হত, আমি এক যক্ষ। যকের মতো আগলে বসে আছি দুই মৃতের সম্পত্তি। সরলামাসীর আলমারি খুললেই বেরিয়ে পড়ে, বিয়ের বেনারসী। রেশমী সায়া। গোল ডাব্বায় সাজিয়ে রাখা গয়না। পৃথিবী যখন ঘুমোয়, আমি খাটের কিনারায়, শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার সব সাজিয়ে, ঝুলিয়ে, কল্পনায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি সরলাকে। যার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক প্রেমিক-প্রেমিকার ছিল না। ছিল, প্রভু-ভৃত্যের। দেহদাস। তার মধ্যে শাসন ছিল, আদর ছিল, স্নেহ ছিল। কিশোরীদার হাতে গাড়ি ইঞ্জিনের মতো, সরলার হাতে আমি। সারারাত বসে বসে মালকিনের কথা ভাবতুম। প্রভু মরে গেলে কুকুরের যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা সেই রকম হয়ে গেল।

কিশোরীদা বললে—তোর ঝামেলাটা আমি বুঝেছি। রাতটা খুব একা লাগছে। তাই না। তোর এই সময় একটা বিয়ে দরকার। চিত্রগুপ্তের মেয়েটাকে পেলে মন্দ হত না। বড় কচি। সৎ, নিরীহ, পবিত্র। তোর হাতে দেওয়া মানে, বেড়ালের হাতে পায়রা দেওয়া। তোর জন্যে চাই, পাকা, দজ্জাল, মেয়েমানুষ।

—ভুল করছ। বাঘিনীর দুধ আমি খেয়েছি, পদসেবা করেছি। মেয়েরাই আমার নিয়তি।

উল্টোটাই হবে। আমিই হয়ে যাব পায়রা। সংসার আমি করব না সংসার আমার করা হয়ে গেছে। বরং সন্ন্যাসের কথা বলো।

অন্য কেউ হলে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিত।—আরে বে, তুই হবি সন্ন্যাসী। বারো বছর বয়স থেকেই যে পেকে ঝিরকুট! কিশোরীদা বললে—হতে পারে। এখন তুই সন্ন্যাসী হতে পারিস। জীবনের গর্ভকোষ দেখা হয়ে গেলে ত্যাগ আসে, বৈরাগ্য আসে। পুরীর মন্দিরের বাইরে, কোনারকে মৈথুন দৃশ্য। নরনারীর হরেক কামকলার মূর্তি। এ-সব পেরিয়েই ধর্মজীবনের শুরু। যত রকমের ভোগের পরেই সব ত্যাগ—পা নেই, মানে চঞ্চলতা নেই, নেই বৃথা ভ্রমণ, স্থির সুস্থির। হাত নেই, মানে ভোগাদি কর্ম নেই, প্রভুর হাতই তোমার হাত। বিশাল দুটি চোখ—আত্মপুরুষকে দর্শন—জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে। চেষ্টা করে দেখ যদি জীবনের অন্য কোনও মানে খুঁজে পাস। এই পেঁয়াজ-রসুন মার্কা জীবনের কোনও মানে নেই রে, দিন আসে দিন চলে যায়।

হঠাৎ একটা ঝোঁক চাপল, যে ভাবেই হোক লেখাপড়াটা করতে হবে। দু'একটা ছাপ না থাকলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। মানুষের সামনে বড় অপ্রস্তুত হতে হয়। আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। মুখ চোখের চেহারা পাল্টেছে। চোখের কোণে কালি নেই। সবল, সুস্থ একজন মানুষের মুখ। তাহলে তো রবিবাবুর কাছে একবার যাওয়া যায়। কতদিন হয়ে গেল। রাগে, অভিমানে যাইনি। আমাকে ভালবাসতেন। ভালবাসাটাই ঘৃণা হয়েছিল। অনেক বয়েস হয়েছে তাঁর। বিকেলের দিকে গেলুম একদিন। পুজো এসে গেল। বাতাসে ঠাণ্ডা ধরেছে। আকাশে ছেলেবেলার মেঘ, যে-মেঘে হাতি দেখতুম, ঘোড়া দেখতুম, উট দেখতুম। যে-মেঘকে মনে হত বিদেশের চিঠি। পূর্ণিমার চাঁদ ঠেলা মারছে পুব আকাশের তলা থেকে। আমার হাতে মিষ্টির বাক্স। যে-সময় চলে গেছে সেই সময়ের জন্যে দুঃখ হচ্ছে। নিজের হাত নিজে ধরলে মানুষের ক্ষতিই হয়। যেমন আমার হয়েছে। আমার বয়েস বেড়েছে, মন বাড়েনি। আমার বুদ্ধি আছে শিক্ষা নেই। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বাগানটা আর আগের মতো নেই। এলোমেলো হয়ে গেছে। আগাছা এসে গেছে। বুকটা ছাঁত করে উঠল। মাস্টারমশাই যে-রুচির মানুষ, তাতে তো এই রকম হওয়া উচিত নয়। নিশ্চয় কোনও গোলমাল। দরজার কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে দরজা খুলে দিল। এই সেই অঞ্জনা। কত বড় হয়ে গেছে। একদম একটা মেয়ে। চোখ দুটো বাদামের ফালির মতো ধারালো।

—মাস্টারমশাই আছেন?

—কে আপনি?

—আমার নাম তারক সরকার। আমি ওঁর ছাত্র ছিলুম। ছেলেবেলায় আপনি দেখেছেন আমাকে।

—বাবা তো খুব অসুস্থ। প্যারালিসিসে পড়ে আছেন।

—কতদিন ?

—প্রায় একবছর।

—মা আছেন ?

—মা তো মারা গেছেন, দু'বছর হয়ে গেল।

—আমি স্যারকে একবার চোখের দেখা দেখতে পারি।

—আসুন।

ভেতরটা মোটামুটি আগের মতোই আছে। জেল্লা একটু কম। শোবার ঘরে খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন রবিবাবু। নাকে একটা নল পরানো। আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছেন। সেই ধারালো নাক-মুখ। মাথা ভর্তি ফুরফুরে সাদা চুল। আরও ফর্সা লাগছে। ধীরে পাখা চলছে ঘরে। হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। মিষ্টির বাক্সটা আগেই রেখে দিয়েছি ডান দিকের টেবিলে।

আপনার নাম ছিল অঞ্জনা।

—এখনো তাই আছে।

—আপনি সেদিন টিউবওয়েল পাম্প করছিলেন, আমি জল খাচ্ছিলুম। আপনিও ছোট, আমিও ছোট, আপনার চেয়ে একটু বড়। স্যার আমাকে স্কুলে ফ্রি করে দিয়েছিলেন। অমনোযোগী ছিলুম বলে দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি সেদিন আমার ব্যবহারে তাঁকে একটু অপমান করে ফেলেছিলুম। আজ ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম। এসে কী দেখছি।

চোখে জল এল। সত্যি জল অভিনয় নয়। তারক সরকার কাজ আদায়ের জন্যে যে কোনও সময় চোখে জল আনতে পারে। কায়দাটা এসে গেছে। বুকের কাছটা ভেতর থেকে একটু মালিশ করে দি। ঘরের মেঝেতে মা পড়ে আছেন, দৃশ্যটা ভেবে নি। ব্যাস, চোখে জল। এ-জল সে-জল নয়। আসল জল।

—সে তাহলে অনেক আগের কথা !

—অনেক, অনেক, তখন আমি কাঠ কুড়িয়ে সংসার চালাতুম।

—বাবা রিটায়ার করলেন, মা মারা গেলেন, বাবা সেই আঘাত সহ্য করতে পারলেন না।

—আপনি একা সামলাচ্ছেন কী করে ?

—এম-এটা করেছিলুম। সকালের স্কুলে মাস্টারি করি। সেই সময়টুকুর জন্যে বাবাকে দেখাশোনার একজন নার্স রেখেছি। এই ভাবেই চলছে। আপনি কী করছেন ?

—আমার লেখাপড়া হয়নি। মটোর মিস্ত্রী। একটা গ্যারেজে কাজ করি। আজ আমি এসেছিলুম মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ে প্রাইভেটে পরীক্ষা দোবো বলে। আপনি আমাকে পড়াবেন ? আমি মাইনে দোবো, যা চাইবেন।

—একটা মেয়ের কাছে একটা ছেলে পড়বে ?

—আমার চরিত্র ভাল, স্যার আমাকে ভালবাসতেন। মাঝে চরিত্র একটু খারাপ হয়েছিল এখন খুব ভাল হয়ে গেছে। কিশোরীদা, মানে আমার গ্যারেজের মালিক আমাকে ভাল করে দিয়েছেন।

—আমি তাঁকে চিনি। আগে বাবার কাছে আসতেন। আপনার প্রস্তাব আমাকে ভেবে দেখতে হবে। কয়েকটা দিন সময় চাইছি।

—সেদিন আমাকে জল খাইয়েছিলেন। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। আজ আমার মনের খিদে।

—আমি ভেবে দেখি। সাতদিন পরে আসুন।

এই একটা কাজ তুমি খুব ভাল করেছিলে তারক সরকার। ইট পেতে খাড্ডা থেকে গাড়ির চাকা তোলা। অনেকটা সেই রকম। জানি মেয়েদের প্রতি তোমার খুব আকর্ষণ। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সিরাজউদ্দৌলার ডায়ালগের মতো—আলেয়া ! জীবনে আমি নারী চেয়েছি, নারী পেয়েছি। নারীকে গুরু করে শক্তিরূপিণী নারীকে শ্রদ্ধা করতে শিখলে। নারী ভোগের সামগ্রী নয়। জগদ্ধাত্রী। তুমি গুছাইত হতে পারো, সেটা তোমার বৈষয়িক দিক। আধ্যাত্মিক দিকে তুমি শক্তির উপাসক। শক্তিকে তুমি প্রেমিকা ভাবতে পারো, প্রভু ভাবতে পারো, মাতা ভাবতে পারো। তিনটেকে তুমি এক করে ফেলতে পারো। প্রভু আমার, প্রিয় আমার, সখা আমার।

সেই প্রাচীন কালীবাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসেছেন। সবাই বলাবলি করছে, অসীম তাঁর শক্তি। যাকে স্পর্শ করছেন তার চৈতন্য হচ্ছে। চৈতন্য জিনিসটা কী আমার জানা নেই। একজন বললে, চৈতন্য হলে মানুষ সবেতেই ঈশ্বর দর্শন করে। ঘটি ঈশ্বর, বাটি ঈশ্বর, চটি ঈশ্বর, সব ঈশ্বর। আমাদের গ্যারেজের মাধাইকে স্পর্শ করেছিলেন, সে রামধোলাই খেয়ে গ্যারেজে ফিরে এল। কিশোরীদা তাঁর আধসেরী মগে চা খাচ্ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন,

—কেসটা কী ! তোর জিওগ্রাফি তো পাল্টে দিয়েছে রে। একটা চোখ তো

দেখাই যাচ্ছে না।

—সামনের দুটো দাঁত ঢকঢক করছে।

—কি সমাধি অবস্থায় বকুলবাগানের খানায় পড়ে গিয়েছিলিস!

সন্ন্যাসী সেতার বাজিয়ে ভজন করেন। আমি আমার ভাগ্য জানতে গিয়েছিলুম। মেলা ভিড়।

—তোর ভাগ্য, তুই নিজে বুঝতে পারিস না।

—ভাগ্য কি সহজে জানা যায়। মহাপুরুষদের কাছে জেনে নিতে হয়। তিনি সকলের মাথায় হাত রেখে বলছেন—চৈতন্য হোক। আর সকলেরই নেশার মতো হয়ে যাচ্ছে। বলছেন—দ্যাখো সবাই ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চিল চিৎকার ছাড়ছে—প্রভু, প্রভু। আর বৃষ্টির মতো বাতাসা পড়ছে। হঠাৎ আমাকে কাছে ডেকে বললেন—গাড়ি কিসে চলে রে! আমি তো অবাক! কেমন করে জানলেন আমি গাড়ির কাজ করি। বললুম—ইঞ্জিনে চলে। তিনি আমার মাথায় ভারী একটা হাত রেখে বললেন—পাগল! শুধু ইঞ্জিনে গাড়ি চলবে? পেট্রোল চাই। পেট্রোল হল আত্মা। সেই রকম মানুষ। মানুষ চলে আত্মজ্ঞানে—তোর চৈতন্য হোক। যেন একটা শক খেলুম। ভেতরটা কেমন হয়ে গেল। পাশেই নাদুদার বোন ছিল—মা, বলে হনুমানের মতো জড়িয়ে ধরলুম, তারপর তোমার ধোলাই কাকে বলে। চৈতন্য ঠিকরে বেরিয়ে গেল।

—তোর অনেকদিন ঘুস ঘুসে জ্বরের মতো ওই ইচ্ছেটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল কী বল?

—সে তুমি যদি বলো—দাদা যখন বউদিকে আদর করে। দু'একদিন দেখে তো ফেলেছি। সোজাসুজি তো দেখিনি লুকিয়ে দেখে ফেলেছি। শব্দটব্দ শুনেছি। বউদির আবার লজ্জা কম। খোলামেলা। চান করে, গা ধোয়। আমি কী করব বলো! আমার তো একটা ভেতর আছে!

—এখন ফার্স্ট এড বক্সটা নিয়ে আয় চৈতন্যের স্পটগুলো অচৈতন্য করে দি। তারপর চল আজ রাত্তিরে তোকে সার্ভিসিং-এ নিয়ে যাব। তোর দরকার হয়েছে। তোর চৈতন্য নয়, তোর ডোবায় ব্যাং ডেকেছে। মত্ত দাদুর ডাকে, ডাকে ডাহুক-ডাহুকী।

সেই সন্ন্যাসীর কাছে আমিও গেলুম। রাত সাতটা হবে। নাটমন্দিরে কালী কীর্তন হচ্ছে সন্ন্যাসীকে শোনাবার জন্যে। তিনি বসে আছেন মন্দিরের পাথর বাঁধানো চাতালে। অন্তরঙ্গ যাঁরা বসে আছেন গা ঘেঁষে। প্রশ্নোত্তর হচ্ছে! জীবের দুঃখমোচনের ফর্মূলা বেরোচ্ছে। সংসারে থেকেও সংসার বন্ধন

মোচনের উপায়। বিষয়-সম্পত্তি-অর্থ থাকা সত্ত্বেও মনকে কী ভাবে দীন-দুঃখীর মতো করে রাখা যায়। মনগরিবী। ওদিকে কীর্তনীয়ারা তার-স্বরে চিৎকার করছেন—পাবি না, খ্যাপা মায়েরে খ্যাপার মতো না খেপিলে। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচির গন্ধ আসছে নাকে। ভাবছি, উঁচু দরের ধর্ম কী অসাধারণ। সুন্দরী মেয়ে বড়লোক ভক্ত। গেরুয়া গদী। নাদুদার বোনকে দেখছি। সন্ন্যাসী চৈতন্য হোক বলার আগেই আমার একটু একটু চৈতন্য হওয়ার মতো হচ্ছে। মাধাইয়ের ভাগ্য যেন না হয়। ছাগলটার দড়ি ধরে বসে আছি। বেড়ার গাছ খাবার জন্যে ছটফট করছে। দীনদয়াল ঘোষাল বলছেন, প্রভু! আমার অভাব নেই, শান্তির বড় অভাব। ছেলের বিয়ে দিয়ে বিপাকে পড়ে গেছি। শ্বশুরবাড়ির ভেড়া হয়ে গেছে। বউয়ের কথায় ওঠবোস। আমার বউয়ের সঙ্গে ছেলের বউয়ের একেবারেই সদ্ভাব নেই। নিত্য অশান্তি, কাক্‌চিল বসতে পায় না। নবগ্রহের স্তব পড়ে পড়ে মুখে ফেকো পড়ে গেল। পলা গোমেদ ধারণ করলুম। কিছুতেই কোনও সুরাহা নেই।

—এটা কোন কাল স্মরণে আছে?

—কলিকাল মহাত্মা, ঘোর কলি।

—কী বলেছেন মহাত্মা তুলসীদাস। মনে আছে তোমার?

—প্রভু! ওসব তো পড়া হয়নি আমার। কেমিস্ট্রি, ফিজিকস পড়েই আমার দিন গেছে।

—শোনো, তোমরাও শোনো তুলসী কী বলছেন। গোউয়া দোকে কুত্তাপালে ওস্‌কি বাছুর ভুখা—গরুর দুধ চ্যাকচৌক দুয়ে নিলে, বাঁটে এক ফোঁটাও রইল না, বাছুর মরছে খিদেতে। সেই দুধ খাচ্ছে বাবুর অ্যালসেসিয়ান। বাছুর মরে মরুক। আর কী? শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ না পাওয়ে রুখা। শালাকে খুব কালিয়া-পোলাও খাওয়াবে, আর পরমারধ্য পিতৃদেবের বরাতে শুকনো রুটি জুটল কী না জুটল। আর কী! ঘরকা বহুরি প্রীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী। মায়েরা যারা এখানে বসে আছ, কিছু মনে কোরো না বাপু—কথাটা হল এই—নিজের বউকে মনে ধরে না পানসে, বাড়ির ঝাঁঝালো ঝি-মাগির সঙ্গে আড়ালে-আবডালে খুনসুটি। লুকিয়ে টাকা দিচ্ছে, এটা ওটা উপহার! বউ বাপের বাড়ি—একেবারে বিছানাতেই নিয়ে গিয়ে তুললে—চিত চোরাওয়ে দাসী। এদের গ্রাম্য ভাষায় বলে ঝিচো। তাই তুলসী বলছেন—ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে ঔর হাঁসি। হে কলিযুগ। তুমি ধন্য! তোমার তামাসা দেখে দুঃখ হয় হাসিও পায়।

—প্রভু ! কলির খেলা তো বুঝতেই পারছি, তবু লেখাপড়া জানা একটা ছেলে !

—তোমার পিতা জীবিত আছেন ?

—গত বছর গত হয়েছেন ।

—তিনিও এই এক অভিযোগ নিয়ে গেছেন। তাঁর পিতাও। এইটাই কলির তামাসা। নারী কত শক্তি ধরেরে বাপ্। এই যে সব মায়েরা বসে আছেন, এক একটি আদ্যাশক্তি, মহামায়া। পুরুষকে পশু করে দিতে পারে, আবার দেবতা। কেউ বিদ্যারূপিণী, কেউ অবিদ্যারূপিণী। বিদ্যারূপিণী শিবের সংসার করে। দোষ তো তোমাদের পুরুষদের, সব কামকীট। মায়েদের তো দোষ নেই। তোমরাই তাদের ভোগী, স্বার্থপর করে তোলো, আদর্শ সংসারী হতে দাও না।

—প্রভু ! সবই তো হল, উদ্ধারের পথ !

—আছে। যিনি অসুখ দেন, তিনিই ওষুধ দেন। সেই বিশ্বাসটা নিয়ে এসো তৈরি করো।

ভক্তির ভিয়েন দিয়ে বিশ্বাসকে পাক করো। একটা গল্প শোনো, চৈতন্যোদয়ের গল্প। যাদের চেতনা হয়েছে তারা কি দেখে জানো, ঈশ্বরই সব করেছেন। এক জায়গায় একটা মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরী করতে যায়। একটি সাধু একদিন ভিক্ষে করতে করতে দেখে যে, গ্রামের জমিদার একটা লোককে বেধড়ক পেটাচ্ছে। সাধু বড় দয়ালু। সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারী রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এক পথচারী গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে জমিদার ভারী মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে, সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তখন তারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভেতর নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে শোয়াল। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে ঘিরে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস করছে। একজন বললে, মুখে একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হল। চোখ মেলে দেখতে লাগল। একজন বললে ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কি না লোক চিনতে পারছে কিনা ? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে মহারাজ ! তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে। সাধু আস্তে আস্তে বলছে, ভাই ! যিনি আমাকে মেরেছিলেন, তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন। বুঝলে কিছু ? সব তিনি

তিরস্কারও তাঁর, পুরস্কারও তাঁর। অশান্তি যিনি দিচ্ছেন, শান্তিও তিনি দিচ্ছেন। এইভাবে সংসারে চলে দেখো, কোনও দুঃখ থাকবে না। তোমরা বিষয়ের জন্যে পাগল, ভোগ সুখের জন্যে পাগল। জ্ঞানোন্মাদ হয়ে দেখো কী আনন্দ। একজন সাধু সর্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাকতেন। কারও সঙ্গে কোনও কথা বলতেন না। লোকে বলত পাগল। একদিন লোকালয়ে এসে কিছু ভিক্ষে করে এসে একটা কুকুরের পিঠে বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগলেন আর কুকুরকে খাওয়াতে লাগলেন। মজা দেখার জন্যে একগাদা লোক জড়ো হয়ে গেল। উপহাস করছে, হাসছে। সাধু তখন বলছেন-- তোমরা হাসছ কেন ? তারপর একটা শ্লোক বলছেন—

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।

এর নাম জ্ঞান। সব বিষ্ণু। বিষ্ণুর ওপর বিষ্ণু, বিষ্ণুই বিষ্ণুকে খাচ্ছেন। বিষ্ণুই হাসছে। গোটা জগৎ বিষ্ণুময়। তোমরা সবাই চেষ্টা করো সেই অবস্থায় পৌঁছতে। দেখবে পৃথিবী কত আনন্দের। এতক্ষণ আমি বেশ চুপচাপ ছিলুম। হঠাৎ মুখ স্লিপ করে বেরিয়ে গেল।

—কী করে পৌঁছব মহারাজ !

—পৌঁছেই আছ, ঘুমচ্ছো বলে জানতে পারছ না। জেগে ওঠো।

—কী করে জাগব ?

—গুরু তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।

বলতে চেয়েছিলুম-- আপনি আমার গুরু হবেন। পর মুহূর্তেই মনে হল, বড় গোলমেলে ব্যাপার। ধর্মের জগতে কথা ছাড়া কিছু নেই। অজস্র কথা। কুমীরে পা কেটে নিয়ে গেল, ভাবতে হবে বিষ্ণু বিষ্ণুর পা কেটে নিয়ে গেল। আমার ভাবনা অতদূর যাবে না।

—মহারাজ, মা বলে ডাকামাত্রই আমার মা সাড়া দিতেন, মা কালী কি সাড়া দেবেন ?

—ডাকার মতো ডাকতে পারলে নিশ্চয় সাড়া দেবেন। রামপ্রসাদকে দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন। তোমাকেও দেবেন।

—সেই ডাকার মতো ডাকাটা কেমন ?

—এ ছোকরার একটু এঁড়ে তর্কের স্বভাব। তিন টান এক করতে হবে।

কী রকম— সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে, বিষয়ীর বিষয়তে। যদি পারো তবেই তোমার ভগবানলাভ হবে।

—মহারাজ পাপ কাকে বলে ?

—যে কাজে মনে চাপ সৃষ্টি হয়। চাপই পাপ। কর্মেরই পাপ পুণ্য। সমস্ত কর্ম তাঁকে অর্পণ করে দিলে আর পাপ-পুণ্য থাকে না। তাহলে আবার একটা গল্প শোনো— ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, গোপীরা এসে উপস্থিত। গোপীরাও পার হবে কিন্তু খেয়া মিলছে না। গোপীরা বললে, ঠাকুর ! এখন কী হবে ? ব্যাসদেব বললেন, আচ্ছা, তোদের পার করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার বড় খিদে পেয়েছে, কিছু আছে ? গোপীদের কাছে দুধ, ক্ষীর, নবনী অনেক ছিল, সব খেলেন। গোপীরা বললে, ঠাকুর পারের কী হল ? ব্যাসদেব তখন তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন ; বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু খেয়ে না থাকি, তোমার জল দুভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা সব সেই পথ দিয়ে পার হয়ে যাব। বলতে না বলতে জল দুধারে সরে গেল। গোপীরা অবাক, ভাবতে লাগল— উনি এইমাত্র এত খেলেন, আবার বলছেন, 'যদি আমি কিছু খেয়ে না থাকি ?' এই হল দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, হৃদয়মধ্যে নারায়ণ, তিনি খেয়েছেন। এই বোধ এলে কর্ম থাকে কর্মফল থাকে না। এ বড় কঠিন অবস্থা। একমাত্র সাধকই পারেন সেই অবস্থায় পৌঁছতে। দেহ শুদ্ধ হওয়া চাই, মন, বুদ্ধি, চিন্তা শুদ্ধ হওয়া চাই। শোনো বাবারা আমি জানি, যদি কেউ পর্বতের গুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বিষয়ে মন, কামিনীকাঞ্চনে মন, সে লোককে আমি বলি ধিক্ ; আর যার কামিনী কাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায় তাকে বলি ধন্য। এ কথা আমার নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের। অতএব ছোকরা নিজের ভেতরের দিকে তাকাও। বাইরে কিছু নেই বাবা। তিনি বসে আছেন তোমার ভেতরে। যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

কালী কীর্তনিয়ার দল গাইতে লাগলেন— পাবি না খেপা মায়েরে, খেপার মতো না খেপিলে। গরম গরম লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, মায়ের ভোগ নাকের পাশ দিয়ে গর্ভমন্দিরে ঢুকে গেল। ভিড় কমে আসছে। সাধুজী এইবার সাধনে বসছেন। উসখুস করছি আমি। কী যে চাই নিজেই জানি না। সাধুজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— ইচ্ছে তো করে, বড়বাবুর খাস দপ্তরে গিয়ে বসি। বাবাজী ছাড়পত্র একটাই শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ মন। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। এটা তোমার লাইন নয়। নিজেকে অন্য রসে

মজিয়ে ফেলেছ বাছা। ফাঁসকলে পড়ে আছ।

—বেরোতে চাই মহারাজ।

—এবারে হবে না। ধান্দা করেই কাটবে।

—কাদের হয় মহারাজ?

—যাদের পূর্বজন্মের সংস্কার আছে।

কিশোরীদা সব শুনে বললে, তোর যেমন কাণ্ড। ধর্মের লাইন শক্ত লাইনরে। অনেক বড় বড় কথা বলতে হয়। সংস্কৃত ছাড়তে হয়। অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে হয়। চারপাশে গাদাগাদা মেয়ে থাকবে, কারও দিকে কুনজরে তাকানো চলবে না। মা জননী, এইসব বলতে হবে। ব্যাপারটায় খুব ভজঘট আছে। আমাদের লাইন, আমাদের লাইনেই থাক। মটোরে মোবিল আর গ্রিজ চালাও। সন্ধ্যেবেলা বোতল খুলে বোসো, মাংসের মাঞ্জা মারো, মেয়েদের প্রেমে বিশ্বাস কোরো না, দেহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারিস।

কিশোরীদা এক সময় ওস্তাদের কাছে গান শিখত। বড়লোকের ছেলে তো। বিরাট স্কেলচেঞ্জ, কাপলার ফিটিং হারমোনিয়াম। মাদার অফ পার্লের রিড। এত ভারী একজনে তোলা যায় না। সেই মাধুরীদেবী ল্যাং মারার পর কিশোরীদা রাত দশটার সময় গানে বসছে। প্রথমেই গাইবে ভবাপাগলার গান। বলে, এইটাই আমার থিম সং—

গানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।
লাগে না ফুল-চন্দন

মন্ত্রতন্ত্রও লাগে না।

এর পরেই চলবে ঠুংরি। বাংলা ঠুংরি— মিছে ভান করে কাঁদিনি সজনী, অভিমান ভরে কেঁদেছি। আমার ওপর গেলাসে মদ ঢালার ভার। খেতে খেতে, গাইতে গাইতে নেশা জাঁকাবে। কিশোরীদার মতো কড়া ধাতের মানুষও কেঁদে ফেলবে। দেয়ালে মায়ের অয়েল পেন্টিং। আমাকে বলবে, চেয়ারে উঠে কাপড় ঝুলিয়ে মায়ের মুখটা ঢেকে দে। কিশোরী মাল খাচ্ছে। মায়ের মনে দুঃখু হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস না শালা। কিশোরীদা গাইয়ে হলেও নাম করতে পারত। টেবিলে পঞ্চাননের কাবাব-রুমালি রুটি। যেই বারোটা বাজবে, বলবে ভোগ নামা। তন্ত্রমতে সেবা হবে। একটার সময় কিশোরীদা বিছানায় চিৎ। হাত দুটো বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে জোড়া হয়ে আছে। অল্প অল্প নাক ডাকছে। মাথার কাছের দেয়ালে গাড়ির একটা হর্ন ঝুলছে।

পরীর মূর্তি লাগানো একটা টেবিল ল্যাম্প। এক সময় আমিও শুয়ে পড়ব। হঠাৎ কোনওদিন বৃষ্টি আসবে জোরে। ভাঙা গাড়ি, নতুন গাড়ি সব ভিজতে থাকবে। ধাতুর চাদর থেকে ল্যাম্প-পোস্টের আলো ঠিকরোবে। তখন মনে হবে, কী ভয়ঙ্কর একা আমি। একজন মানুষকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোলো। সংসার টংসার চুরমার করে জেলখানায় সারা জীবন। মানুষটা এতই নিরেট দুঃখ-টুঃখ কিছু আছে বলে মনে হয় না। চালাক মানুষ সংসার ভাসিয়ে ফুর্তি করে না। বিশ্বনাথ সরকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গবেট।

এইরকম এক রাতে ঘুম যখন আর কিছুতেই আসছে না, জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বর্ষার বৃষ্টি পড়েই চলেছে ঝিরঝির করে, আলোর বিপরীতে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে আলপিন ঝরছে। একটা নতুন গাড়ি এসেছে সার্ভিসিং-এ। পেল্লায় গাড়ি। বেগুনের মতো ঝকঝকে রঙ। তারই আড়ালে সাদা একটা মূর্তি টলছে। আসার চেষ্টা করছে সামনে, পারছে না। ভাল করে দেখে মনে হল আমাদের চিত্রগুপ্তদা। দরজা খুলে দৌড়লুম। তলপেটের কাছের জামাটা রক্তে লাল। গাড়ির বনেটে লোকটা ঝুলে পড়ল। ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বললে— কিশোরী!

চিত্রগুপ্ত পড়ে রইলেন, দৌড়লুম কিশোরীদার কাছে। ধাক্কা মেরে তুললুম। মাঝরাতে ভূতের মতো একটা মানুষ। অত রক্ত। কিশোরীদা এসে নাড়ি টিপে বললে— প্রাণ আছে এখনও, বের কর বড় গাড়িটা। পেছনের সিটে শোয়ানো হল। পেটে ছুরি ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে। কারণটা তখনও জানা যাচ্ছে না। পেটটাকে বেশ করে গামছা দিয়ে বাঁধা হয়েছে। মাঝরাতের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমি পেছনে বসে আছি চিত্রগুপ্তদার মাথা কোলে নিয়ে। রক্তেরও একটা গন্ধ আছে আঁশটে আঁশটে। কিশোরীদা বললে— পুলিসের পেট্রল-ভ্যান ধরতে পারে। আমি কোনও কথা বলব না, মুখে অ্যালকোহলের গন্ধ। তুই বলবি, বাবার হার্ট অ্যাটাক, হাসপাতালে যাচ্ছি।

কিশোরীদা যা বলেছিল, তাই হল সার্কুলার রোডে। পুলিস-ভ্যান গাড়ি থামাল,

—কী আছে!

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম— আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে।

টর্চ ফেলে ভেতরটা একবার দেখা হল। চিত্রগুপ্তদার মাথা আমার কোলে, গামছা দিয়ে পেটের কাছটা কষে বাঁধা। পেটের নাড়ি-ভুঁড়ির কিছুটা বেরিয়ে

এসেছে। অফিসার বললেন— যাও, যাও, নিয়ে যাও দেখে তো মনে হচ্ছে, শেষ অবস্থা।

ভাগ্য ভাল, গাড়িটা একজন ডাক্তারের। পেছনের কাঁচে ক্রশ মারা।

মাঝরাতের ঝিম মারা হাসপাতাল। কিশোরীদা বললে— কোন শালা মারলে, এমন একটা নিরীহ মানুষকে। যে শালাই মারুক, এখন বাঁচলে হয়। সংসার তো পথে বসবে।

আমাদের হাসপাতালকে জাগিয়ে তোলা এক কঠিন কাজ। কুম্ভকর্ণকে জাগানোর মতো। সুন্দর চেহারা খুব কাজ করে। কিশোরীদাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল আপেলের মতো সুন্দরী নার্সের। সমস্যার শেষ নেই। পুলিস না পাঠালে হাসপাতাল কেস নেবে না। সেও এক হাতে পায়ে ধরা। এমার্জেন্সির টেবিলে তোলা হল। এইবার রক্ত। কিশোরীদার গ্রুপ মিলল না। মিলে গেল আমার। কে বলেছে, তারক গুহ্যইত কেবল নিতেই জানে। সেই রাতে পরিষ্কার এক বোতল রক্ত দিয়ে দিল। লাল, তাজা রক্ত। কিশোরীদাই যেন ডাক্তার। বললে, আপাতত মাল পেটে প্যাক করে সেলাই করে দিন।

—সেলাই করলেই হয়ে যাবে, ভেতরে সাত জায়গায় পাংচার।

কিশোরীদা বললে, চল, ডাক্তাররা যা পারেন করুন। আমাদের অন্য কাজ আছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি চালাতে চালাতে বললে, —ইনভেস্টিগেশান, আমাদেরই করতে হবে। কোন শালার হাতের কাজ !

—কী করে করবে ?

—আমাদের কাছাকাছিই হয়েছে। জয়সওয়ালের মদের দোকানের কাছাকাছি। তা না হ'লে হেঁটে এল কী করে ! আমার মনে হয়, কেসটা এতদূর গড়িয়েছে, অনুরাধার জন্যে।

—কেন ? অনুরাধা এর মধ্যে আসে কী করে !

—আসে কী করে বুঝিস না। বাঙলাদেশে জন্মেছ বোঝো না, মেয়ে হল ভোগের বস্তু। অনুরাধাকে খাবলে খাবার জন্যে অনেকে তৈরি। বেশ কিছু মাস্তান পেছনে লেগেছিল। আমাদের প্রথম কাজ চিত্রগুপ্তর চশমাটা খুঁজে বের করা। চশমা ছাড়া লোকটা অন্ধ। চশমাটা পেলেই ঘটনাস্থল পাওয়া যাবে। ভোর হওয়ার আগেই স্পটটা বের করতে হবে। তা না হলে পুলিস কিছুই করবে না। যে করেছে তাকে ধরতেই হবে।

—আগে আমরা বাড়িতে যাব না ! বউদি জেগে বসে আছে।

—আগে চশমা। স্পটটা আমি দেখতে চাই। তারপর খবর, কান্না, শ্মশান,

যা হয় হবে। পুলিস কিছু না করলে বদলাটা আমাকেই নিতে হবে।

জয়সওয়ালের মদের দোকানের কাছটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ডানদিক দিয়ে ঘুরে গেলেই বেশ্যাপল্লী। উল্টোদিকে একটা রিকশাস্ট্যান্ড। তার ওপারে রাস্তা খোঁড়া। জলের পাইপ বসছে। ঘোষ ডাক্তারের চেম্বার। একটা সোনাঝুরি গাছ। অনেক দূরে গাড়িটা রেখে, আমরা জয়সওয়ালের দোকানের সামনে দাঁড়ালুম। কেউ কোথাও নেই। এমন কী একটা কুকুরও নেই। কিশোরীদা বললে—

—চিত্রগুপ্ত মাল খেয়ে বেরল। একটা সিগারেট কী বিড়ি ধরিয়ে সে বাড়ি যাবে। তার মানে রাস্তা পার হয়ে, রিকশাস্ট্যান্ডের ধার দিয়ে, ঘোষ ডিস্পেনসারির সামনে দিয়ে, সোনাঝুরির তলা দিয়ে নন্দলাল মুখার্জি রোডে ঢুকবে। ডানপাশে মোহিনীর তেলেভাজার দোকান। পেছন দিকে একটা খালি জমি। আচ্ছা চল, চিত্রগুপ্তের পথ ধরে চল। রাস্তার দিকে নজর রাখবি।

—অন্ধকারে কী দেখবে?

—টর্চ আছে আমার হাতে।

বেশ গা ছমছম করছে। শেষ রাতের আকাশে ঢ্যালা ঢ্যালা তারা। সোনাঝুরি গাছটাকে মনে হচ্ছে তুলি দিয়ে আঁকা। রিকশাস্ট্যান্ডটা পেরোতেই চোখে পড়ল একপাটি চটি। কিশোরীদা টর্চ জ্বেলে দেখে বললে, চিত্রগুপ্তর পায়ে চটি ছিল?

—খেয়াল করিনি।

—এগো।

কিছু দূরেই সেই খোঁড়া খুঁড়ি। গভীর একটা গর্ত। মাটির ঢিপির পাশেই সেই চশমা। চোখ থেকে ছিটকে আড় হয়ে পড়ে আছে। কিশোরীদা চশমাটা তুলে নিল। কী খেয়াল হল, টর্চের আলোটা গর্তের মধ্যে ফেলল, —এ কী। সাদা একটা মূর্তি গর্তের মধ্যে গোঁত খেয়ে পড়ে আছে। দু ধাপ নেমে, আলো ফেলেই কিশোরীদা বললে, সর্বনাশ! এ তো আমাদের মাধাই!

এরপর আমাদের পালাবার পালা। চশমা আর জুতোটা আমরা তুলে নিলুম। কোনও ভাবেই যেন পুলিশের হাতে না পড়ে। চিত্রগুপ্ত মেরেছে, না মাধাই আগে মেরেছে। কিশোরীদা বিড়বিড় করছে। গজটা পেটে কে পুরেছে! তৃতীয় আর একজন! মাধাই অবশ্য দুর্দান্ত ছেলে। অনুরাধার ওপর নজর ছিল। প্রেমট্রেম করছিল কি না কে জানে! ইদানীং খুব মাঞ্জা চড়াচ্ছিল

হিন্দি গান গাইত গুনগুন করে। পেয়ার, মোহব্বতের গান।

চিত্রগুপ্তদার বাড়ি গিয়ে আমাদের মাথা ঘুরে গেল। বউদি জেগে বসে আছে। অনুরাধা, মাধাই মানে আমাদের মহেন্দ্র বিশ্বাস আর চিত্রগুপ্তর আসল নাম অনাথবন্ধু চক্রবর্তী, তিনজনে বেরিয়েছিলেন অনুরাধার চোখ দেখাতে ডাক্তারের কাছে। রাত ভোর হতে চলল, কেউ ফেরেনি। মহেন্দ্র অনাথদার পাড়াতেই থাকে। কিশোরীদা বললে, শিগগির দরজায় তালা লাগান ; থানায় যেতে হবে। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। বউদি মেয়ের মতোই সুন্দরী। রাতজাগা আর উদ্বেগে মুখটা থমথমে। দরজায় তালা দিলেন। হাত কাঁপছে।

সোনাঝুরির পাতায় ভোরের আলো আর বাতাস লেগেছে। আমরা সেই ভয়ঙ্কর গর্তটার উল্টোদিক দিয়ে এলুম, পাছে বউদি মহেন্দ্র বিশ্বাসের লাশটা দেখে ফেলেন। দূর থেকে দেখছি, জয়সওয়ালের দোকানের বুকে কে একজন বসে আছে ঝুপড়ি মেরে। আর একটু এগোতেই দেখা গেল, বসে আছে অনুরাধা। বউদি আগে ছুটলেন, পেছনে আমরা। পরনে শাড়ি নেই। কালো সায়া ফালাফালা। ব্লাউজ টুকরো টুকরো। ব্রেসিয়ার নেই। ঠোঁট দুটো কামড়েছে কে, রক্ত জমাট। সারা শরীর চিরুনি আঁচড়ানো। কপালের ডানপাশ থেঁতলানো। বুক দু'হাতে ঢেকে জড় মূর্তির মতো বসে আছে অনুরাধা।

বউদি ওইখানেই ফিট হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। অনুরাধা কোনও কথা বলতে পারছে না। কিশোরীদা ফট করে নিজের জামাটা খুলে মেয়েটার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। দু'পায়ের ভেতর দিক দিয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে এসেছে। আমরা ধরাধরি করে গাড়ির পেছনের আসনে মেয়েকে বসিয়ে দিলুম। বউদি অঝোরে কাঁদছে। অনুরাধার সারা শরীর দিয়ে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। মনে হয় গায়ে মদ ঢেলেছিল। মুখ চেপে ধরে খাওয়াবার চেষ্টা হয়েছিল। বুকের খোলা অংশে সিগারেটের আগুনের ছেঁকার দাগ। ভেতরে আরও কত আছে কে জানে ! মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বউদি কাঁদছে, আমার এ সর্বনাশ কে করলে। কিশোরীদা বললে, কান্নার পৃথিবী আর নেই। এখন মারের পৃথিবী, খুনের পৃথিবী। ভগবানের কাছ থেকে পৃথিবীর ইজারাদারি শয়তান কিনে নিয়েছে। কেঁদে কী হবে ! কে শুনবে আপনার কান্না !

ঘোষ ডাক্তারকে টেনে তোলা হল। প্রবীণ মানুষ। শরীরের সাধারণ মামলায় এই অঞ্চলের অদ্বিতীয়, এই মামলাটা আধুনিক কালের। সম্প্রতি

মানুষের পরিচয় ঘটছে এই সবের সঙ্গে। মা, মেয়ে আর ডাক্তার ঘরে। আমরা বাইরে। কিশোরীদা গুম মেরে আছে। স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর আদর্শ। যাঁর পূর্বপুরুষ নিজের বৈঠকখানায় বসে মানুষের বিচার করতেন। নিজের তালুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। নিজের লেঠেল প্রয়োজনে বুকে বাঁশ ডলে মানুষকে যমের বাড়ি পাঠাত। সেই রক্ত কিশোরীদার শরীরে টগবগ করে ফুটছে।

ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, —রিপিটেড রেপ, গ্যাং রেপ। যা আজকাল হচ্ছে। ভেতরটা বেশ ড্যামেজ হয়েছে। সতেরোটা বার্ন স্পট। বাইটিং। ল্যাসিরেসান। ব্রেস্ট দুটো বেশ ড্যামেজ হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিব দিয়ে ফেলে রাখতে হবে। পোড়া জায়গাগুলোয় ক্যালেন্ডুলা লাগান। ঘুমে ওষুধ দিচ্ছি। মেয়েটা মরে যেত। নেকড়ে বাঘে ধরেছিল। পুলিসে যাবে না?

—পুলিস! স্বাধীনতার পর পুলিসের ভূমিকা পাল্টে গেছে। উল্টে এম কাণ্ড করবে মেয়েটা হয়তো মরেই যাবে। আর অপরাধীকে ধরা! এদে দাদারা আছে, কিছুই হবে না। মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

নাটক অন্য রাস্তায় মোড় নিল। নটা সাড়ে নটার সময় অনাথব পরিবারকে অনাথ করে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। হাসপাতালে হাসপাতাল ডাক্তারে ডাক্তার থাকলে চিত্রগুপ্তদা বেঁচে যেতেন হয়তো। পেটে বালতিটাব রক্ত জমে গিয়েছিল। পুলিস এসে মহেন্দ্রর লাশ তুলল। গলাটা ফাঁক কে দিয়েছিল। হাতের মুঠোয় এক খামচা চুল। গর্তের মধ্যে বিলিতি একট লাইটার। একটা ক্যাশমেমো, একপাটি দামি জুতো পাওয়া গেল। পুলি আমাদের গ্যারেজে এল। ওসি কুতুবুদ্দিন সব শুনলেন—মেয়েটার একট এজাহার নেওয়া দরকার।

চারটে ছেলে ছিল, একজনকে সবাই কালুদা, কালুদা বলছিল।

—কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল?

—নতুন যে ফ্ল্যাটবাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে তারই একটায়। একজন সব সম আমার বুকে ছুরি ঠেকিয়ে রেখেছিল। মহেন্দ্রদাকে মেরে গর্তে ফেলে দিল বাবা খুব চেষ্টা করেছিল বাঁচাবার। কী হয়েছিল জানি না। আমার নাকে একটা রুমাল ধরেছিল।

অনুরাধা কেঁদে ফেললে। অফিসার বললেন, সরকারী একজন ডাক্তারকে দিয়ে মেডিকেল টেস্ট না করালে কেস তো টেঁকবে না। এ তো মনে হচ্ছে

কালু কালোয়ারের কাজ। এর আগে ময়না বলে একটা মেয়েকে সেম ব্যাপার করেছিল। এ তল্লাটের আদ্দেক তো ওদের দখলে। চোরাই লোহালক্কড়ের কাঁচা পয়সা। দিনে ব্যবসা রাতে রেপ। দেশটার কী অবস্থা করে ছাড়লে আমাদের দাদারা।

কিশোরীদা বললে, আমাদের টেস্টফেস্ট দরকার নেই। জল ঘোলা। মেয়েটার জীবন একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। ময়না কেসে, ময়নার ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল পায়খানার পিট থেকে। সে-কেসে আপনারা একজনকেও ধরতে পারেননি।

—ধরেছিলুম। ছেড়ে দিয়ে চাকরি বাঁচাতে হয়েছিল।

—এ-কেসেও তাই হবে সায়েব।

পুলিসের খবর পুলিস জানে। আমি জানি আমার কিশোরীদার খবর। লোকটা তিনদিন গুম মেরে রইল। একেবারে অন্য লোক। চারদিনের দিন মাঝরাতে আমাকে জিজ্ঞেস করলে—

—তুই আমাকে ভালবাসিস।

—একজনকেই বাসি, সে তুমি।

—যা বলব, শুনবি ?

—মরতে বললে মরব।

—তোর সঙ্গে অনুরাধার বিয়ে দোবো।

—লোকে যাতা বলবে।

—দেখ জগা, তুই মার্কা মারা। খুনের মামলায় কাঠগড়ায় চড়েছিস। তোর সামনে তোর মাতাল বাবা মাসীকে রেপ করেছে। তুই সেই রাতেই নিজের পশুটাকে আবিষ্কার করেছিস। তোর ডবল বয়সী সেই মেয়েটার সঙ্গে পাপ করেছিস। তুই বেশ্যালয়ে গেছিস।

—বেশ্যালয়ে যাইনি।

—আলবাৎ গেছিস, আমার সঙ্গে গেছিস। তোর বাপের মেয়েমানুষের কাছে। তুই দু'কান কাটা। এক' কানকাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দু'কানকাটা যায় ভেতর দিয়ে। তুই আমাকে বলছিস, লোকে কী বলবে। তোর লোকভয় আছে। তুই একটা অসহায় মেয়ের জীবনের দায়িত্ব নিতে পারবি না ?

—কিশোরীদা, আমার যে একটা অন্য ব্যাপার আছে।

—কী ব্যাপার। সেই হেডমাস্টারমশাইয়ের মেয়ে অঞ্জনা, সে তো আমাকে

পড়ায় !

—পড়বি।

—আমি যে তার প্রেমে পড়েছি।

—সে না মারলেও, আমি তোর নিতম্বে একটি লাথি কষাব। তারক, প্রেম জিনিসটা দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া নয়। এই মেয়েটাকে বিয়ে কর, জীবনে সুখী হবি।

—আমার বরাতটাই সেকেন্ড হ্যান্ডের। যেমন অনেকে সারাজীবন সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি চাপে।

—হ্যাঁ তাই। তোর রুচিটাই সেই রকম ? জেনে রাখ সেকেন্ড হ্যান্ড তারের যন্ত্রেই বাজনা খোলে। মনে নেই তোর, সরলামাসীকে সেই রাতে দেখে তোর কি হয়েছিল ? তোর স্বভাবটাই তো ফেউয়ের স্বভাব। বাঘের পেছনেই ফেউ আসে।

—একটু ভাবতে দাও।

—একটা দিন।

—বেশ, কাল তোমাকে বলব।

চিন্তাটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কিশোরীদার গাড়িটা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত রইলুম গ্যারেজে। সাদা রঙ হঠাৎ কালো করা হচ্ছে। কারণ জানা নেই। রঙ তুলতে তুলতে জীবন বেরিয়ে যাবার দাখিল। একটা হ্যান্ড শর্ট। মাধাই মরে গেছে। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল। তা না হলে তিনজনে চোখ দেখাতে যাবে কেন ! রাত আটটা নাগাদ কিশোরীদা ওস্তাদের মতো সেজেগুজে, আতর টাতর মেখে গান গাইতে বসে গেল। আমি গেলুম অঞ্জনার কাছে পড়তে। তার সাংসারিক কাজে সাহায্যও করি। বেশ লাগে। আটা মেখে দিলুম, কি আনাজ কেটে দিলুম। কি বাজার করে এনে দিলুম। তার ফাঁকে ফাঁকেই পড়া চলে। বুদ্ধিটা আমার খারাপ ছিল না, চরিত্রটা নষ্ট হয়ে গিয়েই সব হেজে গেল। অঞ্জনা বলেছে লেগে থাকতে পারলে আমার হবে। মাঝে মধ্যে মাস্টারমশাইকে বেডপ্যান দি বা ইউরিন্যাল ধরি। অঞ্জনা রাঁধতে রাঁধতে আমাকে পড়ায়। আমি কি পাগল ? অঞ্জনা আমাকে বিয়ে করবে কেন ? তার এক ইঞ্জিনিয়ার প্রেমিক আছে। দু'জনে ইংরিজিতে কথা বলে। আমি একটা মিস্ত্রি মার্কা ছেলে। কালচারের তফাত হয়ে যাচ্ছে। আমি পড়ি ভৃত্যের শ্রেণীতে, অঞ্জনারা হল বাবু।

রাতে ফিরে এসে দেখি, কিশোরীদা তখনও গান গেয়ে যাচ্ছে—কার তরে

নিশি জাগো রাই। তুমি যার আসার আশায় আছো, তার আসার আশা নাই। একা একাই আসর জমিয়ে ফেলেছে। কিশোরীদার মদ খাওয়াটা ক্রমশই কমে আসছে। আমাকে বললে—খানা লাগা। সেই পুরনো আমলের মার্বেল পাথরের টেবিল। মাথার ওপর ছোট একটা ঝাড়বাতি। বেলোয়াড়ি ঝাড়। বেলজিয়ামের কাট গ্লাসে আলো ঠিকরোচ্ছে। পূর্বপুরুষদের ছায়া পড়ছে যেন দেয়ালে।

রাত দুটো। ঘুম আর আসে না। নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করছি অনবরত। কোথায় আমার স্থান। সমাজের কোন স্তরে। আমি কি ভদ্দরলোক! অঞ্জনার মনে হয় একজন চাকরের প্রয়োজন ছিল। ছাত্র-কাম-চাকর। আর আমারও দুর্বলতা। মেয়েদের দাস হতে আমি ভালবাসি। কোনও এক জন্মে বোধহয় হাবসী খোজা ছিলুম। অনুরাধাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অসহায় বসে আছে। ফালা ফালা সায়া। এখানে ওখানে দুধ সাদা উরু বেরিয়ে আছে। ভরাট কাঁধ। ভারী বুক। নির্বোধ পশুর দৃষ্টি। মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলতে পারত। পতিতালয়ে পাচার করে দিতে পারত। কালু কালোয়ারের রমরমা ব্যবসার নাম পাপ। অনুরাধা ক্রমশই আমার মনে চেপে বসছে। কী সুন্দর মেয়েটা।

পাশের বিছানায় কিশোরীদা চিৎ। লোকটার গুণ হল, শোয়ামাত্রই গভীর ঘুম। ঠেলে তুললুম। মুহূর্তটা হারিয়ে যাওয়ার আগেই ধরে রাখতে হবে। ঘুম চোখে বললে—কী হল আবার!

—শোনো, অনুরাধাকে আমি বিয়ে করব। তোমাকে আমি বারো ঘণ্টা আগেই জানিয়ে দিলুম।

কিশোরীদার বালিশের পাশে আতরের শিশি ছিল। আমার গায়ে মাখিয়ে দিলে।

—আমি জানতুম, তুই আমার কথা রাখবি। মেয়েটা ভীষণ ভাল। পায়রার মতো। শিকারী বেড়ালের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর মায়ের অবস্থাটা একবার ভাব। যদ্দিন আমি আছি—তারপর কী হবে! তুই একটু দেখিস মাকে।

—ধরো ওর যদি ছেলে এসে যায় এরই মধ্যে।

—তার মানে?

—মানে সে-রাতে যা হয়ে গেল তার ফলে যদি...

—সে সব হবে না। আর যদি হয়ও তার দায়িত্ব নিবি। তবেই না তুই

মানুষ। যে আসবে, তার কী দোষ। সে কী জানে। অবশ্য তা হবে না। যা, রাত এখনও একটু পড়ে আছে। ঘুমিয়ে নে। সকালে অনেক কাজ।

সাদা গাড়িটা কুচকুচে কালো হয়ে গেল। অন্ধকারে দাঁড়ালে বোঝা যাবে না। পালিশটালিশ মেরে একেবারে ঝকঝকে। সাদাটাই তো ভাল ছিল। কিশোরীদা বললে, কারণ আছে। গাড়িটা একটা পাপ করবে। একটা ফল্‌স নাম্বার প্লেট লাগানো হল। আসলটা খুলে রাখা হল ভিতরে। —এটা কার নম্বর লাগালে ?

—সে গাড়িটা অনেক আগে মারা গেছে। এটা সেই গাড়ির ভূত। নে মালটাকে চোখের আড়ালে রেখে আয়। এমন জায়গায় রাখ, কেউ যেন দেখতে না পায়।

কিশোরীদা একটা গাড়ির তলায় ঢুকে গেল। রাতের কিশোরী, দিনের কিশোরী দুটো আলাদা লোক। কিশোরীদার ঠাকুর্দার আমলের লাইব্রেরিটা আজও আছে। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-ইংরেজি সাহিত্য সবই আছে। চামড়ার বাঁধাই। সোনার জলের লেখা। প্রায়ই সেখানে ঢুকে পড়ে, তখন কিশোরীদা আবার আলাদা এক মানুষ। লাইব্রেরির দেয়ালে একটা অয়েল পেন্টিং। পাগড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন রাজার মতো এক মানুষ। ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই পরিবারের সমস্ত বোল বোলার নায়ক। বাড়িটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, এলোমেলো হয়ে অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে। একটা অর্গান আছে। ধুলো মাখা। একটা বীণা আছে। কিশোরীদার মা বাজাতেন। একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আছে—কিশোরীদার ভাইয়ের। ন বছর বয়সে মারা যায়। পুরনো জমানার ওপর একটা নতুন জমানা খাড়া হয়েছে।

॥ ছয় ॥

রাত এগারো। জয়সওয়ালের মদের দোকানের সামনে, ঘোষ ডাক্তারের চেম্বারের ধারে, ঘন অন্ধকারে আমাদের কালো অ্যাম্বাসাডার শিকারী বাঘের মতো ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরীদা স্টিয়ারিং-এ ঘাপটি মেরে আছে। আমি পাশে। দোষীর বিচারের ভার, সাজার ভার কিশোরীদা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। কালু কালোয়ারকে এমনভাবে মারা হবে আইনের ক্ষমতা নেই আততায়ীকে ধরে। আমরা সাত দিন ধরে ওয়াচ রেখেছি। কালু কী করে ! কালুর স্বভাব। বারোটা নাগাদ জয়সওয়ালের ঠেক থেকে কালু তিনজন

চামচাকে নিয়ে বেরোবে। বেরিয়ে, কালু সামনে দশ-বারো হাত ডাঁটসে এগিয়ে গিয়ে ডানদিকের নালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলবিয়োগ করবে, ততক্ষণে চামচারা রাস্তা ক্রশ করে সোনাঝুরি গাছের দিকে এগোতে থাকবে। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। গাছটার তলায় এসে একজন নেশা জড়ানো গলায় ডাকবে, ওস্তাদ ! তখন কালু গর্ভবতী গাভীর মতো রাস্তা পেরোবে সিগারেট ধরাতে ধরাতে। ঠিক এই পয়েন্টে অ্যামবাসাডার স্টার্ট নেবে। সেল্‌ফ আর ব্যাটারি এমন করা হয়েছে, হাত ছোঁয়ালেই ইঞ্জিন লাফিয়ে উঠবে। অ্যাম্বাসাডারের পার্কিং থেকে কালুর দূরত্ব কুড়ি থেকে তিরিশ গজ। তার মধ্যেই গাড়ি আশি কিলো স্পিড পেয়ে যাবে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। কালু স্ম্যাশড়। গাড়ির কোনও আলো জ্বলবে না। আমরা সোজা টপ স্পিডে এগিয়ে যাব। আসল নাম্বার প্লেট পালটে কিশোরীদা চলে যাবে ঝাড়গ্রাম। আমি নেমে ফিরে আসব গ্যারেজে।

কালু বেরল। এগিয়ে গেল সামনে। চামচা তিনটে রাস্তা পেরল। কালু জলবিয়োগ করে ঘুরছে। কিশোরীদা সেল্‌ফ মারবে, এমন সময় পেছন দিক থেকে এগিয়ে এল পুলিসের জিপ। আমরা দু'জনেই পাশে হেলে পড়লুম। পুলিস যেন ভাবে, কার গাড়ি পার্ক করা আছে কে জানে ! জিপটা এগিয়ে গিয়ে কালুর পাশে থেমে পড়ল। ওসির মোটা উরু বেরিয়ে এল। দু'জনের অন্তরঙ্গ রসিকতা হল কিছুক্ষণ। কালুর হাত থেকে কিছু একটা ওসির হাতে চলে গেল। জিপ বেরিয়ে গেল। আমাদের কাজ হল না। কিশোরীদা বললে, শালা ! বাঁচ গিয়া।

ওরা হই হই করতে করতে চলে গেল। কে একজন সিটি মারল। সিটিটার মানে আছে। সতেরো নম্বরের দোতলায় ছোট এক পরিবার ভাড়া এসেছে। স্বামী-স্ত্রী, একটা বাচ্চা। স্ত্রী আধুনিকা। বেশ দেখনাই যৌবন। লাল ব্লাউজ, লাল শাড়ি পরে স্বামীর বাইকের পেছনে চেপে যখন যায়, তখন দিনের দাদারা চিৎকার করে—আগুন ! লেগেছে লেগেছে আগুন। মহিলার গর্ব বেড়ে যায়। তিনি আবার সখের থিয়াটারে অভিনয় করেন।

রাতের সিটিটা সেই মহিলার উদ্দেশ্যে। কালু যেন কংস। সব মহিলাকেই তার চাই। এই দুনিয়াটা যেন তার পিতার সম্পত্তি। কিশোরীদা বললে, আবার কাল। পরমায়ু এখনও আর একদিন আছে। আমরা গ্যারেজে ফিরে এলুম।

—এই ঝুঁকি নিজের ওপর না নিয়ে, এ-পাড়ার নেতাকে বলো না ?

—দুটো দামড়া। কালু দুটোকেই হাতে রেখেছে। আমাকে জ্ঞান দিয়ে

ছেড়ে দেবে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই নারী-ধর্ষণ হয়ে আসছে। মেয়েরা লোভ দেখায় কেন ? আগুনে ঘি ঢাললে আরও জ্বলবে, না নিববে ! আর পুলিসকে তো দেখলি ! হাত সাফাই করে চলে গেল। এ কাজটা আমাকেই করতে হবে। তা না হলে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হবে না। আমার পূর্বপুরুষরা নিজেরাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন।

—যদি কিছু হয়ে যায় ?

—নার্ভাস না হলে কিছুই হবে না।

—কালু যদি বেঁচে যায় !

—বাঁচতে পারে না। অসম্ভব ব্যাপার। আমি ব্যাক করে এসে আবার পিষে দিয়ে বেরিয়ে যাব।

—চ্যালারা যদি বোম চার্জ করে !

—করবে না। প্রথমত, অ্যাকসানের সময় ছাড়া ওদের কাছে বোমা থাকে না, দ্বিতীয়ত, যদিও থাকে, ওরা কালুর জন্যেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমার সব ভাবা হয়ে গেছে তারক। আজ ওই পুলিসের জিপটা না এলে হয়ে যেত।

দ্বিতীয় দিন। রাত এগারো। আমরা ঠিক আছি। কালু বেরল। সঙ্গে বেরল জয়সওয়াল। কালুর কাঁধে হাত। কালু আর নালার দিকে গেল না। চামচা তিনটে সোনাঝুরির তলা দিয়ে চলে গেল বস্তির দিকে। বিশগজ দূরে আমাদের শিকার। কথা বলছে মদের দোকানের মালিকের সঙ্গে। কিশোরীদা টান টান। সামনে পেছনে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। শীত আসছে। বাতাস শুকনো। জয়সওয়াল দোকানে ঢুকে গেল। কালু সামনে এগোচ্ছে। তার হাত থেকে কী একটা টং করে পড়ে গেল রাস্তায়। কালু নিচু হচ্ছে। আমাদের ইঞ্জিন লাফিয়ে উঠল প্রায় নিঃশব্দে। ডবল পিক আপ। গোলার মতো গাড়িটা সামনে ছুটে গেল। আঁক করে একটা শব্দ। গাড়িটা লাফিয়ে উঠল। ঘষড়ানোর শব্দ। দেহটা জড়িয়ে গেছে। আশি থেকে একশো। ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকানি, খুলে গেছে। ঝড়ের বেগে সামনে। পেছনে দূরে একটা লরি আসছে টপ স্পিডে। ততক্ষণে আমরা অনেকটা এসে গেছি। এতক্ষণ দম বন্ধ ছিল। পেট্রল পাম্প পেরিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। কিশোরীদা ঘামছে।

—নাম্বার প্লেটটা পাল্টা।

লরিটা বড় রাস্তা ধরে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল। কিশোরীদা বললে,

—বুঝলি কিছু ?

—কী বলো ? লরিটা থামেনি তো ?

—রাইট, ডবল রানওভার। আমাকে আর সেফটির জন্যে ঝাড়গ্রাম পালাতে হবে না। শালা ! দুটো খুন আর একটা রেপের বদলা।

আমরা গ্যারেজে চলে এলুম। কিশোরীদা বললে, সাবধানের মার নেই। গাড়িটা ওয়াশ করব।

হোস দিয়ে গাড়িটার আগা-পাশতলা ওয়াশ করা হল। রক্তের দাগ যদিও থাকে সব মুছে গেল। ভাল করে মুছে, ওপর ওপর পালিশ মেরে একপাশে রেখে দেওয়া হল। কিশোরীদা কোথা থেকে একটা বোর্ড এনে ঝুলিয়ে দিল—ফর সেল।

—চল, বাকি রাতটা এক পেগ ব্র্যান্ডি মেরে তোফা একটা ঘুম।

সেই প্রথম ব্র্যান্ডি খেয়েছিলুম। সবাই বলে তারক গুছাইত নিজের পয়সায় মাল খায় না। কথাটা বহুত ঠিক। মালের পেছনেই মানুষের সব মাল চলে যায়। মাল ধরার চেয়ে একজন বড় লোক ধরা বুদ্ধিমানের কাজ। সন্ধেটা ভালই কাটে। তালে তাল দিয়ে চলতে পারলে—আহার-ওষুধ দুইই হয়। একটু বোকা বড় লোক হতে হবে। যে-মনে করে, পৃথিবীর সব ব্যাপারে তার কথাই শেষ কথা। চালাক তাঁবেদারকে শুধু বলতে হবে, ঠিক বলেছেন। এরপরে আর কোনও কথা নেই। একেবারে খাঁটি কথা। এরপর আর কোনও কথা চলে না।

বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে কিশোরীদা বললে, কাল সকালেই আমাদের একটা কাজ হবে, গাড়িটার কালো রঙ তুলে আবার সাদা করা।

—তোমার নিতাই-ফিতাই সন্দেহ করবে না ?

—আমি বলব, জগা, কাল এক জ্যোতিষী বলেছে, আমার কালো রঙ চলবে না।

সাত সকালেই জয়সওয়ালের দোকানের দিকে একবার গেলুম। অঞ্চলটা রোজ যেমন জেগে ওঠে সেইরকমই জেগে উঠেছে। ঠেলা, রিকশা, লরি, বাস ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চলেছে। দুধের গাড়ি, খবরের কাগজঅলা। বাড়তি কিছু চোখে পড়ল না। জায়গাটার ওপর দিয়ে প্লেন একবার হেঁটে গেলুম হন হন করে। ফিরে আসতেই কিশোরীদা বললে, কিছু অস্বাভাবিক !

—কিছু না। রোজ যেমন, সেই রকমই।

—মাথাটা নেমে গেছে এইবার ধড়টা আপনিই কাবু হবে, যতদিন না আর একটা মাথা উঠছে।

গাড়িটাকে আবার ওয়ার্কসাইটে টেনে এনে রঙ তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল। নিতাই বললে—বসের হেডগিয়ার ফেঁসে গেছে। তখনই বলেছিলুম, কুচকুচে কালো রঙ কোরো না। আরে শালা, আমিও এক জ্যোতিষী।

সারাটা দিন উদ্বেগে কেটে গেল—এই বুঝি পুলিস আসে। পুলিস আর এল না। সন্ধের পরেই জলুস বের হল। কালু কালোয়ার শ্মশানে চলেছে। ঢোল-সহরৎ করে। নেতা-টেতা দু-একজন আছে। চ্যালারা শোক ভোলার জন্যে একটু টলমলে হয়েছে। কালুর আত্মীয়-স্বজনরা ভুঁড়ি ফুলিয়ে, দুনিয়া কাঁপিয়ে চলেছে। কালুর কালু-জন্ম শেষ হয়ে গেল। আবার স্লোগান দিচ্ছে—কালু কালোয়ার অমর রহে। ব্যান্ড পার্টি ব্যান্ড বাজাচ্ছে—মুকেশের গান পিকলুতে—মেরা নাম রাজু—প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক প্যাঁক—প্যাঁক।

তিন চার রাত একটু ঘুমের অসুবিধে হল। মনে হত, বিছানাটা একটা গাড়ি। তলায় আস্ত একটা লোক। হাড়গোড় ভাঙার শব্দ। প্যাচ করে মাথা থেঁতলানোর শব্দ। কিন্তু যেই অনুরাধার ছবিটা ফুটে উঠত একটু শান্তি পেতুম। খুনকা বদলা খুন। সে রাতে যে-কটা ছিল, সব কটাকে শেষ করা যেত!

এক রাতে কিশোরীদা বললে, যে কোনও একটা বাড়ি বেচে দে। দুটো বাড়ি রাখার কোনও মানে হয় না।

—চোদ্দ বছর পরে বিশ্বনাথ সরকার ফিরবে।

—ডালিম খুব কষ্টে আছে। একদিন গিয়ে কিছু টাকা দিয়ে এসেছি বাড়িটা তাকে ছেড়ে দে। ও-পাড়ার কিছু বিহারী তাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

—এই পাড়ায় ওই জিনিস বসাবে?

—সে-ডালিম আর নেই। পুজো-আচ্চা করে। গলায় কণ্ঠি নিয়েছে। হ নাম করে। হরি নামে সব শুদ্ধ। ওই পাপের বাড়িটা ওকে দিয়ে দে। যত হোক, একদিন তোর জীবন বাঁচাবার জন্যে নিজে থেকেই ছুটে এসেছিল আর, যে-পেটেই জন্মাক, বাপের ছেলে ভাইই হয়। সেটা মানুষ না হলে আ একটা কালু কালোয়ার তৈরি হবে। সরলার বাড়িটা অনেক ভাল। সেইটা তুই অনুরাধাকে নিয়ে সুখে সংসার কর। ডালিম পাশে থাকলে তোদে দেখাশোনার সুবিধে হবে। —অনুরাধাকে খারাপ পথে নিয়ে যাবে। বাবু ধ এনে দেবে।

—তুই বড় উল্টোপাল্টা ভাবিস। জানবি, বেশ্যারা শেষ জীবনে খুব ভ হয়। ধার্মিক হয়। পাপ না করে এলে ঠিক ঠিক পুণ্য হয় না। পাপীদে

কখনও ভয় পাবি না। ভয় হল পুণ্যাত্মাদের! মুখে বলি হরি। কাজে অন্য করি। সেই সাধু আর বেশ্যার গল্প। সাধুর ডেরা থেকে বেশ্যার ঘর দেখা যেত। সাধু একদিন বেশ্যাকে ডেকে বললেন, পরকালের কথা মনে আছে তো! এই যে এত পাপ করছিস। বেশ্যা বললে, ঠিকই বলেছেন মহারাজা! কিন্তু আমার যে উপায় নেই। সাধু বললেন, আস্তে আস্তে কমাও। ঈশ্বরে একটু মন লাগাও। বেশ্যা চলে গেল। সাধু সব ছেড়ে নজর রাখলেন বেশ্যার ঘরের দিকে। এক একটা খদ্দের ঢোকে আর তিনি একটা করে ইট রাখেন। ইট জমতে জমতে ছোট একটা টিলার মতো হয়ে গেল। একদিন বেশ্যাকে ডেকে বললেন, এই দেখো তোমার পাপের পাহাড়। ভগবান বললেন, ওটা ওর পাপের পাহাড় নয়। তোমার পাপের পাহাড়। ও ওর জীবিকা নির্বাহের জন্যে নিরাসক্ত কাজ করেছে, আর তুমি সাধন ভজন ছেড়ে ও কি করছে তাই দেখেছ। এ হল তোমার অতৃপ্ত কামের প্রকাশ। বেশ্যা একদিন সব ছেড়ে বসে গেল ভজনায়। নিমেষে সিদ্ধিলাভ। আর সাধু ঘষটাতে লাগত সারাজীবন। কিছুই হল না তার।

—আজ সেই গল্পটা শেষ করো না। সেই বুড়োর গোলাপ ফুল।

—তোর মাথায় এখনও সেই গল্প ঘুরছে তাহলে জমিয়ে বোস। যমালয়ের গোলাপবাগানে সেই বেশ্যাসক্ত বৃদ্ধ নরকে যাওয়ার আগে মাত্র পাঁচ মিনিট বেড়াতে পারবে। যমদূতরা সেখানে তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। বলেছে, এখানে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, কোনও আপত্তি নেই। তবে পাঁচ মিনিটের পরে আর নয়। এইবার সেই পাগলা বুড়ো করেছে কী, বাঁশকে চেঁচে চেঁচে দুটো ধারালো কাঠি করেছে। দু'পাশে গোলাপের সারি আর মাঝখানে সরু পথ, এখন বৃদ্ধ সেই কাঠি দিয়ে দু'পাশের গোলাপের বোঁটা কেটে কেটে ফেলছে। ফুলগুলো কেটে কেটে পড়ে যাচ্ছে, আর ছুটছে কী বলে? কৃষ্ণায় নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ বলে। অজস্রবার বলছে আর ফুলগুলো কেটে কেটে পড়ছে। পাঁচ মিনিট পরে দূত এসে বলছে, এসো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। বৃদ্ধের দূতের কথায় কান দেওয়ার সময় কোথায়—সে ফুল কাটতে কাটতে ছুটছে আর বলছে, কৃষ্ণায় নমঃ। দূত ফিরে এসে যমরাজকে রিপোর্ট দিচ্ছে—মহারাজ। ভয়ানক ব্যাপার—এই পাপী গোলাপবাগানের যত ফুল সব বাঁশের কাঠি দিয়ে কেটে কেটে ফেলছে, আর অজস্র কৃষ্ণায় নমঃ, কৃষ্ণায় নমঃ বলছে। ধর্মরাজ ঘাবড়ে গেছেন, এখন এই পাপীকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করানো চলবে কি না! যম চলে গেলেন ব্রহ্মার কাছে, বিধাতা, আপনি তো সব

জানেন। এই পাপী যমালয়ে এসে অনেকবার কৃষ্ণায় নমঃ বলেছে। এখন একে নরকযন্ত্রণা ভোগ করানো যাবে কি না? ব্রহ্মা বললেন, তাইতো হে, ভারতবর্ষে ধর্মযাজন করবার কথা আছে, যমালয়ে ধর্মযাজন করার ফলের কথা তো নেই। একটা কাজ করি চলো, দু'জনে মিলে যাই চলো। যাঁর নাম তাঁর কাছে। যম আর ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গেলেন ভগবানের কাছে। তিনি বললেন, ভারতবর্ষেই ধর্মকর্ম, তার ফলভোগ, তবে আমার নাম সর্বত্র। যে কোনও জায়গায় আমার নাম নেওয়া যায় আর তার ফল পাওয়া যায়। চলো, আমি যাচ্ছি তোমার সেই পাপীর কাছে। ভগবান যমালয়ে গেলেন। তখন শ্রী ভগবানকে দেখে পাপী বললে, আপনি কে আমি জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মন তৃপ্তিতে ভরে গেছে। এখন যদি আমাকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা দেয়, আমার কোনও দুঃখ নেই। ভগবান বললেন—যন্ত্রণা! যন্ত্রণা দেবার আর কোনও উপায় নেই। তুমি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে গেছ। আমি যে তোমার জন্যে বহুদিন চিন্তা করেছি। সারাটা জীবন শুধু পাপ কাজ করে চলেছ। এর কি গতি হবে? যখন শেষের দিন তুমি ফুল নিয়ে যাচ্ছিলে বেশ্যাকে দিতে, তখন তোমার হাত থেকে গোলাপ ফুলটা আমিই ফেলে দিয়েছি। আর তুমি, যে গোটা জীবন বেশ্যাসক্ত সে কখনও কৃষ্ণায় নমঃ বলতে পারে? বলতে পারে না। আমিই তোমাকে বলিয়েছিলাম, কৃষ্ণায় নমঃ। যমালয়ে এসে তোমাকে যে পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিল এরা, সেই সময়ের মধ্যে তুমি যে প্রতিটি ফুল কেটে কেটে পাঁচ মিনিটে অজস্র ফুল কেটেছ আর কৃষ্ণায় নমঃ বলে অর্পণ করেছ—এ বুদ্ধি তোমায় কে দিয়েছিল? আমিই দিয়েছিলাম। সব আমার কৌশল। অতএব তোমার আর কোনও পাপ নেই। এস আমার সঙ্গে। পাপীকে গরুড়ের পিঠে তুলে নিয়ে ভগবান চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। গল্পটা তোকে বলার উদ্দেশ্য—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি রথ তুমি রথী। কালু কালোয়ারের মরণ এসেছিল। ব্যাপারটা কত সহজ করে দিলে জয়সওয়াল। আরও সহজ করে দিলেন ভগবান নিজে। কালুর হাত থেকে চাবির রিংটা পড়ে গেল। কালু নিচু হল, যেন মরণটাকে মাথা পেতে বরণ করে নিলে। পাপ কর—করবি পুণ্য মিশিয়ে। অনুরাধাকে বিয়ে করাটা তোর সেই পুণ্য। এই নে চাবি। ওই আলমারিটা খোল।

সেকালের বিশাল আলমারি। লতাপাতার নকশা তোলা অপূর্ব শিল্পকর্ম। পাল্লাটা খোলামাত্রই পাখির মতো ঝাপটা মেরে উড়ে গেল অতীতের চন্দন গন্ধ। ভেতরে থরে থরে সাজানো শাড়ি। পরপর গয়নার বাক্স। কিশোরীদা

বললে, তোর আর অনুরাধার বিয়েতে আমার যৌতুক। বেনারসী আছে সাচ্চা জরি বসানো। বালুচরী আছে, সিল্ক আছে, টাঙ্গাইল আছে। গয়নার কেসগুলো নিয়ে আয়।

মাঝরাতে গা ছমছমে পৃথিবীতে যেন গুপ্তধন দেখছি। নেকলেস, চুড়ি, আংটি, টায়রা।

—সব তুমি আমাদের দেবে কেন ?

যক্ষের মতো আগলে বসে আছি, আর কী হবে। তোরা আমার প্রিয়।

—তা বলে এত টাকার সম্পত্তি। ব্যবসায় লাগাও।

—আমার মায়ের জিনিস আমি বেচতে পারব না তারক। আমার বউও আর আসছে না। ইঞ্জিন নিয়েই থাকব। আর আমার বোতল। আর একটু একটু ভগবান।

লেতা হুঁ মকতর-এ গম্-এ দিল-মেঁ সবক হুনূজ,
লেকিন য়েহী কেহ্ 'রফৎ' গয়া, অওর 'বূদ' থা ॥
হৃদযন্ত্রণার পাঠশালায় শিক্ষানবিসী করছি এখনো,
দুটি মাত্র পাঠ রপ্ত হয়েছে—'ছিলো' আর 'গেলো' ॥

নিতাই-এর চালচলন আমার সুবিধের মনে হচ্ছিল না। এর আগে আমাকে দু'তিন দিন জিজ্ঞেস করেছে, ব্যাপারটা কী বল তো! গাড়িটা সাদা ছিল কালো হল, আবার সাদা হয়ে গেল!

কিশোরীদার খেয়াল। খেয়ালী লোক। জ্যোতিষী বলেছে কালো রঙ সহ্য হবে না।

—অন্য কোনও ব্যাপার আছে।

—তুই খুঁজে বের কর।

এরপর একদিন রাতে দেখি নিতাই জয়সওয়ালের দোকানের পাশে ঘাপটি মেরে আছে। কালু কালোয়ারের এক শাগরেদের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর দু'জনেই ঢুকে গেল মদের দোকানে। নিতাইয়ের একটা বোন চরতে শিখেছে। ছেলে ধরে আর ছাড়ে। কিছু মেয়েকেও লাইনে টেনে এনেছে। সঙ্গে কালু কালোয়ারের চেলাদের কয়েকজন আছে। লরি ভাড়া করে হিন্দি গান বাজাতে বাজাতে পিকনিকে যায়। কালীঠাকুর বিসর্জনে নিতাইয়ের বোন লরির মাথায় দাঁড়িয়ে কোমর দুলিয়ে নাচে। নিতাইয়ের বাবা মারা গেছে। শাসন করার কেউ নেই। মাস্তানরাই মাথা খাচ্ছে। নিতাই মদ ধরেছে।

কিশোরীদাকে বললুম, তুমি একটু সাবধান হবে না কি ? নিতাই ওদলে গিয়ে

ভিড়েছে। সন্দেহটা ঢুকিয়ে দিলে তোমার ওপর বদলা নিতে পারে। ধরো যদি আড়াল থেকে গুলি মেরে দেয়, কি গ্যারেজে আগুন লাগিয়ে দেয় !

—পারবে না, আমি চম্পাকে হাত করে ফেলেছি।

—চম্পা আবার কে গো !

—কালুর পরে যেটা উঠছে। যার সঙ্গে তুই নিতাইকে দেখেছিস, ওটার নাম ফকির। নিতাইয়ের বোনের বাবু। নিতাইয়ের বোন এখন সোনাগাছিতে ব্যবসা করছে। তোর চেয়ে অনেক বেশি খবর আমার কাছে আছে। নিতাই এখন পাতার নেশা ধরেছে। পারিস তো ওটাকে বাঁচার রাস্তা দেখা। মাথার ওপর তিন তিনটে বোন। বিধবা মা।

—ও যে রাস্তা ধরেছে, সে রাস্তা থেকে কেউ ফেরে না কিশোরীদা। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। ঘরের শত্রুকেই ভয়।

তোর বিয়েটা হয়ে যাক তারপর দেখবি আমার কী লাইন ! তার আগে কালই চল ডালিমকে নিয়ে আসি। সে আমাদের লোক। দরকার হলে কোমর বেঁধে খিস্তি করতে পারবে।

আমার নাম তারক সরকার লোকে আমাকে গুছাইত বলে। বলে বলুক। আমি কিন্তু ইট, কাঠ, পাথরের মর্ম তেমন বুঝি না। সে বোঝে ভানু বোস, আমার গুরু। জমি-বাড়ি কিনছে আর বেচছে, আর চেহারাটা দিনকে দিন লাল থেকে আরও লাল হচ্ছে। ডালিম সরকারের ডেরায় গিয়ে মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। রেল কোম্পানির মালবাবুর পেয়ারের মেয়ে মানুষ। চেহারাটা টস্কায়নি তবে চেকনাই নেমে গেছে। গয়নাগাঁটি চলে গেছে। খোঁপোর ঝুমকো গেছে। কিশোরীদা বললে,

—তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি। বিশ্বনাথ সরকারের বাড়িতেই তুমি থাকবে। তারক তো সম্পর্কে তোমার ছেলেই হল। সে তোমার দেখাশোনা করবে। এখানে পড়ে আছ, কে তোমাকে দেখবে !

ডালিম বললে, ভাগাড়ে মড়া পড়লে শুকুনির অভাব হয় না কিশোরীবাবু। আমাকে আর একজন ধরেচে।

—সে আবার কে ?

—বিশ্বনাথবাবুর প্রাণের বন্ধু ভোলানাথবাবু। লোক ভাল। মালকড়ি আছে। রুগ্ন। হাঁপানির টান আছে। তুমি যেতে বলছ। লোভ লাগছে। কিন্তু ভোলাবাবু আমাকে ছাড়বে না। ব্যারাকপুরে একটা বাগানবাড়ি আছে। বউটা খুব ভুগছে। এখন তখন। বলেছে, মরলেই আমাকে সেখানে নিয়ে

যাবে। দু'জনে বারান্দায় বসে বসে গঙ্গাদর্শন করব। আর গোপালসেবা। মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।

—তোমাদের স্বভাব বুঝি পাল্টায় না!

—আর জ্ঞান দিয়ো না কিশোরীবাবু। জ্ঞানী, মূর্খ, ছেলে বুড়ো সব এক চক্করে ঘুরছে। সব পাশ বালিশ আর কোল বালিশের খদ্দের।

—মাল টাল ছেড়েচো।

—ধরলে ছাড়া যায়! তোমরা আমাকে ভদ্দর পাড়ায় তুলবে। সেখানে সবাই আমাকে জানে। রাতে এসে উৎপাত করবে। রাস্তায় বেরোলে জ্বালাবে। অত বড় একটা খুন হয়ে গেছে ও-বাড়িতে। ওটা তো ভূতের বাড়ি। মাঝরাতে এসে গলা টিপবে।

—খুনটা তুমি করিয়েছিলে?

—আমরা কারোকে খুন করতে বলি না কিশোরীবাবু। আমাদের জন্যে পাগল হয়ে গিয়ে লোকে খুন করে। মেয়েছেলে কী জিনিস সে তো তুমিও জানো। তুমিও তো পাল্লায় পড়েছিলে। তবে তোমরা হলে আলাদা জাতের। জাতে মাতাল, তালে ঠিক। তোমাদের মধ্যে ত্যাগ আছে।

—তুমি তো গোঁপে তেল দিয়ে বসে আছ, ডালিম তোমার কাঁঠাল কবে খসবে! তোমার ব্যারাকপুরের বাগানবাড়ি!

—কিশোরীবাবু একটা জায়গায় মানুষ খুব দুর্বল, সেই জায়গাটা যদি চেপে ধরা যায়, মানুষ আর পালাতে পারে না। আমরা সেই জায়গাটা চিনি। যখন যৌবন ছিল তখন তোমরা ছিলে, এখন বুড়োরা আছে। আমাদের কাছে ভালবাসা কিনতে আসে। তখন আমাদের হাতে চেন তাদের গলায় বকলস।

কিশোরীদা রাস্তায় নেমে এসে বললে, শুনলি! কথা শুনলি! সত্যি কথা শুনতে কি বিশ্রী লাগে। যাক ও ভূতের বাড়িতে ভূতই থাক। আচ্ছা তারক, তোর বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে না!

—একদিন তো গিয়েছিলুম দেখা করার জন্যে। দেখাই করলে না।

—লজ্জায়।

—ও মানুষের লজ্জা নেই। রাগে দেখা করেনি। ওই যে আমি সাক্ষী দিয়েছিলুম। মাথার তেলের গন্ধ।

—তোর মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী।

—তুমি কেন দায়ী হবে।

—ওই যে বলে এসেছিলুম তোর মাকে দিয়ে দরখাস্ত করাব।

—সরলামাসীর ওপর সন্দেহ হয় না ?

—মেয়েছেলের কাজ নয়, তা ছাড়া অন্য সব প্রমাণ।

—বিশ্বনাথ সরকারের কাজ। গয়নাগুলোর দরকার ছিল। নিতে পারছিল না। মালের ঘোরে লোকটা তো অন্যরকম হয়ে যেত।

কিশোরীদা আমাকে নিয়ে অনুরাধাদের বাড়িতে এল। সাধারণ একটা বাড়ির নীচেরতলায় ভাড়া থাকে। বিষণ্ণ পরিবেশ। কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। উগ্র একটা কিছু রান্না হচ্ছে। ঝাল, টক, পেঁয়াজ, ছ্যাঁচড়াই হল গরিবের সম্বল। ওই দিয়েই ভাত ওঠে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন অনুরাধার মা। মাথায় ঘোমটা তুলে বললেন, আসুন, আসুন। একটাই ঘর। অনুরাধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আমাদের পাশ দিয়ে। মেয়েটা আরও বড় হয়েছে, আরও সুন্দর হয়েছে। পুরুষের ছোঁয়া লাগলে মেয়েদের অমন হয়।

—অনু এঁদের জন্যে দু'কাপ চা করো।

—আমরা চা খাব না। এই মাত্র খেয়ে আসছি। কাজের কথা আছে, বসুন।

ঘরে দুটো টিনের চেয়ার ছিল, আমরা বসলুম। মহিলা তক্তপোশে পেছন ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—অনুরাধার সঙ্গে তারকের বিয়েটা তাড়াতাড়ি সারতে চাই। ছেলেটি ভাল।

—যত তাড়াতাড়ি পারেন ততই ভাল। কালু গাড়িচাপা পড়ার পর, কিছু বাজে ছেলে ওদেরই দলের, বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা করছে। রাত হলেই আমার ভয় করে। মেয়ের তো বাইরে বেরনো বন্ধই হয়ে গেছে। বাড়িঅলার বড় ছেলেটাও পেছনে লেগেছে। বিচ্ছিরি চোখে তাকায়। শুনিয়ে শুনিয়ে যা-তা গান গায়। আবার যদি মেয়েটাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ওরা সব পারে।

—সেই জন্যেই এসেছি। আমিও সেই ভয়ই করছি। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যেই বিয়ে হবে। মেয়েকে ডাকুন।

অনুরাধা ঘরে এল। নীল শাড়ি। অনেক চুল মাথায়। খোঁপাটা বিশাল হয়েছে। চওড়া পিঠ। এক নজর দেখেই মাটিতে চোখ নামালুম। সেদিন সন্ন্যাসী মহারাজা বলছিলেন, মেয়েদের পায়ের দিকে তাকালে আর মনে কাম আসে না। অনুরাধার পা দেখছি। অতই সহজ মহারাজ! আপনি তো বলেই

খালাস। মন যে কত বেয়াড়া, সে একমাত্র তারক সরকারই জানে। পা বেয়ে মন ওপরে উঠছে সাপের মতো কিলবিলিয়ে। তারক সরকারের মতো জঘন্য আদমি আর দুটো নেই। কিশোরীদা অনুরাধার অনামিকায় একটা আংটি পরিয়ে দিয়ে বললেন, সুখী হও। অনুরাধা প্রণাম করার জন্যে নিচু হল। আমার মনে হল, বিয়েটা আজ রাতে হলেই ভাল হয়। সন্ন্যাসী মহারাজ সেদিন বলছিলেন, বিচার! তোমরা সব বিচার করবে। বস্তুবিচার। যেমন, এই দেখ, টাকাতেই বা কী আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কী আছে। বিচার করো, সুন্দরীর দেহতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি মল, মূত্র—এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

মহারাজ! কেন যাবে না। ঈশ্বর তো কোনওদিন সামনে এলেন না। ধ্যানে তাঁকে ধরতে হবে। মূর্তি যে সব আছে, কারও চারটে মাথা, কারও মাথা যদি বা একটা হল, হাত হয়ে গেল চারটে। আর এই যে কিশোরীদার সামনে হেঁট হয়ে আছে কামিনী, চওড়া পিঠ, পাতলা ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের ফিতে, হাড়, মাংস, চর্বি বলে তো চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। অত বড় খোঁপা! চুল খুলে দিলে পিঠ ছাপিয়ে কোমরে। ভালবাসা আপনি এসে যাচ্ছে গুড়গুড়ে বানের মতো। অনুরাধাকে অনেকটা মা সরস্বতীর মতো দেখতে।

মহারাজ! সরি! আমার বিচার আসছে না। আমার কাঞ্চন চাই। এই রকম এক কামিনীর জন্যে। প্রেম আর কাম, ভোগ আর দুর্ভোগ সব মিলিয়ে জীবনটা হয়ে যাবে গামলার রসগোল্লা। একদিন মৃত্যু এসে টপ করে তুলে খেয়ে ফেলবে। তারপর যো হোগা, সো হোগা।

ফেরার পথে কিশোরীদার আর এক চেলা গোপাল বললে, গ্যারাজের পেছনে কালুর দলের তিনটে ছেলে ঘাপটি মেরে আছে অনেকক্ষণ। গোপালকে—থ্যাঙ্ক ইউ, বলে কিশোরীদা গাড়ি ঘোরাল।

—যাবে কোথায়?

—ফেস টু ফেস হলে আমাকে রিভলভার চালাতেই হবে। তিনটে কেন তিরিশটা ছুঁচোর মহড়া আমি নিতে পারি। কেসে জড়িয়ে যাব। এখন ঠাণ্ডা মাথা চাই। চল থানায় গিয়ে আড্ডা মেরে আসি।

—থানা তো তোমাকে সাহায্য করবে না।

—সাহায্যের তো প্রয়োজন নেই। ওসি আজ রাতে আমাদের আসরের প্রধান অতিথি। এক বোতল বিলিতি আছে।

—তার চেয়ে চলো চম্পাকে নিয়ে আসি।

—মন্দ বলিসনি। আজই ওকে আমার সাদা গাড়িটা প্রেজেন্ট করে দি।

—সে কি ?

—তারক। গিভ অ্যান্ড টেক এই হল নিয়ম। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবি।

চম্পার মাকে দেখলে মনেই হবে না, ভদ্রমহিলার গর্ভ থেকে মাস্তান বেরোতে পারে। বাড়িতে নতুন রং পড়েছে। ভেতরে কোথাও কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। বেশ জমিয়ে পুজো হচ্ছে। চম্পা রোজ নিজেই পুজো করে। সে বিষ্ণুর উপাসক। নারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে ঠাকুরঘরে। আমরা বসে রইলুম। গোপালের মতো একটি বালক কোলে কোলে ঘুরছে। বেশ সম্পন্ন একটি পরিবার। সবাই বেশ হাসিখুশি। আধঘণ্টা বসে থাকার পর চম্পা এল। কপালে চন্দনের টিপ। পেছন পেছন এল প্রসাদ। কিশোরীদা বলল, তোমাকে যে গাড়িটা দেব বলেছিলুম, সেটা রেডি। আজ দিন ভাল, তোমার হাতে দিতে চাই। নাও রেডি হয়ে নাও। আমার ওখানে চলো, নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে আসবে। একেবারে চাবুকের মতো গাড়ি।

—কোনও সরবত খাবেন ?

—সরবত আমার ওখানেই হবে।

—আমি তা হলে রেডি হয়ে আসি।

চম্পা ড্রেস পালটে এল। একেবারে বোম্বে ছবির হিরো। বড় বড় চুল। খাড়া নাক। যখন পুজো করে তখন ভক্ত সাধক, যখন মাল খায় পাঁড় মাতাল যখন অ্যাকসান করে পাকা ভিলেন। চম্পা মেয়েদের শ্রদ্ধা করে। নিজের মাকে দেবী বলে মানে।

গ্যারেজের গেট খুলে কিশোরীদা সোজা গাড়িটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল নির্ভয়ে। সামনের সিটে কিশোরীদার পাশে চম্পা। আমি পেছনে আধশোয়া। কোথায় কে ঘাপটি মেরে আছে কে জানে। কিশোরীদার আগেই চম্পা নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে তিনটে ছায়ামূর্তি নেকড়ের মতো এগিয়ে এল। চম্পা হল শিকারী বাঘ। ডানপাটা সোজা উঠে গেল ডানপাশে। ফকির ছিটকে পড়ল। বাঁ হাতটা বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল বাঁপাশে, সনাতন ছিটকে পড়ল গাড়ির বনেটের ওপর। তৃতীয় ছায়াটা ছিল নিতাইয়ের। পালাচ্ছিল, চম্পা ডানপাটা নাচের ভঙ্গিতে সামনে ঠেলে দিল। এক গাদা কুচোকাঁচা মরচে ধরা লোহা পড়েছিল একপাশে। নিতাই মুখ থুবড়ে পড়ল তার ওপর। চম্পা ফকিরকে ঘাড় ধরে তুলল,

—বল, কিভাবে মরতে চাস ! কুত্তার মতো, না গরুর মতো !

—গুরু ! সেমসাইড হয়ে গেছে

—সেমসাইডেও তো গোল হয়। টিম হেরে যায়।

এক ধাক্কায় ফকির গিয়ে পড়ল মরচে ধরা লোহার গাদায়। —সনাতন তুই কোথায় যাবি লেড়িকুত্তা। লেড়িদের ঠ্যাংটাই আগে যায়। চম্পা বুটপরা পায়ে একটা লাথি কষাল। সনাতন কুকুরের মতোই আর্তনাদ করে উঠল। নিতাইয়ের চোখে লোহা ঢুকে গেছে।

—এখানে তোরা কিসের ধান্দায় এসেছিলিস !

ফকিব চিঁচিঁ করছে।

—কালুর বাপের ক্ষমতা নেই তোদের বাঁচায়। কিমা করে দেব। কিমা।

—আমরা কিশোরীদাকে মারতে চেয়েছিলুম।

—তা তো মারবেই। একটা ভাল মানুষকে না মারলে চলবে কী করে। লোকটা যে আর পাঁচটা লোককে খাওয়াচ্ছে। তোদের পাকাপাকি ব্যবস্থা কাল হবে। তোদের ওই পেঁচোটাকে হাসপাতালে নিয়ে যা, বাকি জীবন একটা চোখেই চলুক। ওরে ফোকরে লিডার হতে গেলে কিছু এলেম লাগে। মদ, মেয়েমানুষ আর পাতায় হয় না রে। যাঃ শালা ফোট্।

চম্পা এমনভাবে হাত দুটো ঝাড়ল, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। মশাটশা মেরেছে। কিশোরীদা আর চম্পার আড্ডা চলল কিছুক্ষণ। দুতিন পেগ আরক উড়ে গেল। নিতাইয়ের বোনটা পাড়াটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে—সে কথাও এল। ওঝার মৃত্যু সাপের ছোবলে, বলে চম্পা হাসতে লাগল হা হা করে। কিশোরীদা বললে,

—চম্পা, তুমি একটু দেখবে তো ছেলে আর মেয়েটাকে ?

—কোন ছেলে, কোন মেয়ে ?

—এর নাম তারক, মটোরের কাজ ভালই শিখেছে, এর সঙ্গে ওই অনুরাধার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

—কেয়া বাত হায়। দিয়ে দিন। কোনও শালার ক্ষমতা হবে না চম্পার রাজত্বে মেয়ে তুলে নিয়ে যায়। চম্পা মরে গেলে কী হবে সে কথা পরে। আজ উঠি কিশোরীদা। গাড়িটার দাম নিতে হবে কিন্তু।

—এখুনি দিয়ে দাও, তোমার বুক পকেটেই আছে। দোস্তি। পারবে দিতে।

—আলবৎ পারবে।

দুজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন দুই মায়ের পেটের

ভাই। চম্পা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—তোমার প্রাণের গাড়িটা দিয়ে দিলে ?

—ওটা খুনী। জোড়াতালি দিয়ে আর একটা করে নিতে কতক্ষণ, সেটা হবে প্রেমিক। রঙটা হবে আকাশের মতো হালকা নীল। আমার স্টকে দশটা গাড়ির মালমশলা আছে। গাড়ির ভাবনা আমার নেই। আমি কিং অফ কারস।

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। অমাবস্যা। কালীঘাটের মন্দিরে জবরদস্ত ভিড়। পুজো চলছে দাপটে। আমরা বসে আছি পূজারীর ঘরে। অনুরাধা লাল বেনারসীতে লাল। অনুরাধার মা সাদা কাপড়ে সাদা। অনুরাধার মুখে টিপ টিপ চন্দনের ফোঁটা। পূজারীর স্ত্রী সাজিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে। সামান্য আয়োজনে বিয়েটা হয়ে গেল। সম্প্রদান করলেন কিশোরীদা। হৃদয়ে হৃদয়দান হয়ে গেল। দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। পূজারী বললেন, মেয়েটি সর্ব সুলক্ষণা। এর কল্যাণে স্বামীর কল্যাণ হবে। কিশোরীদা বললেন, আজকে তোদের বাসর হবে আমার ঘরে। কাল থেকে নিজেদের সংসার।

না, আমার বিয়েতে সানাই বাজেনি। নিমন্ত্রিতরা গভীর রাত পর্যন্ত আসেনি উপহার হাতে। টিপ টিপ আলোর ঝালর ঝোলেনি বাড়ির সামনের দেয়ালে। ভিয়েন বসেনি। কেউ দেয়নি কো উলু, কেউ বাজায়নি শাঁখ। অন্ধকার রাতে শান্ত বিয়ে, মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা। পূজারীর বিশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ। কিছু ফুল ছিল। সুগন্ধ ছিল।

সঙ্গে এসেছিল মন্দিরের শাক্ত ভোগ। তাই খাওয়া হল ফলাও করে। কিশোরীদা গান শোনালেন। প্রাণখোলা গান। মনে হচ্ছিল, আকাশ থেকে দড়ির মই নেমে এসেছে। সুরের মই। ধরে ধরে উঠে যাচ্ছি মেঘলোক ছাড়িয়ে চন্দ্রলোকে, গন্ধর্বলোকে। শেষ গান গাইলেন, হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না। হঠাৎ গান থামিয়ে,—রাত ঢলে যায়। যাও তোমরা বাসরে চলে যাও। প্রিয়া ! মোছো আঁখিজল, মধুরাত বয়ে যায়।

ঘরটা ছিল কিশোরীদার মায়ের ঘর। খুব উঁচু ছাত। এই ঘরটা আগে কখনও খোলা হয়নি। দেয়ালে কিশোরীদার বাবার বড় ছবি। একপাশে বাঘথাবা বিশাল খাট। কাঠের গায়ে লতাপাতার কাজ। মার্বেল পাথরের মেঝে। দেয়াল আলমারিতে পোর্সিলেনের বিলিতি পুতুল। দু'কোণে দুটো কর্নার টেবিল। দেয়ালে সোনার জলের কাজ ছিল। অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

বড় বড় জানলা। দরজার মাথার ওপর আধা গোলে নানা রঙের কাঁচ। ঘরটার পাশ থেকেই বাড়িটার ভাঙন শুরু হয়েছে। ওই দিকেই ছিল, নাচমহল, চণ্ডীমণ্ডপ, অতিথিশালা। ছবি আঁকার স্টুডিও। বিলিতি চিত্রকররা এসে ছবি আঁকতেন। একটা স্টাডি ছিল। সেকালের বিখ্যাত নাট্যকার এখানে বসে নাটক লিখেছিলেন। মেবারপতন। সেইসব দিনের নাচ, গান, বাজনা, হাসি, গল্প, উৎসব, স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে একপাশে। কিশোরীদা বললেন, আমি তোমাদের পাশেই আছি। দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা করে নাও।

অনুরাধা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঝরাতের দেবীর মতো। বার্মা কাঠের দরজার পাল্লা বন্ধ করে সেইখানেই বসে পড়লুম দরজায় পিঠ রেখে। আমি তারক সরকার বা গুছাইত যাই হই না কেন, এই বুদ্ধিটুকু ঈশ্বর আমাকে সেই রাতে দিয়েছিলেন—তুমি যদি একটা দু'পেয়ে জন্তুর মতো ওই সজীব, সবুজ, ঢলঢলে লাল মেয়েটার দিকে এগিয়ে যাও, ওর মনে পড়ে যাবে সেই রাতের আতঙ্কের কথা। তিনটে কি চারটে মদ্যপ পশু। আধা-খেঁচড়া একটা ঘর। চুন, বালি, সিমেন্টের ছড়াছড়ি, গন্ধ, ছাদ ঢালাইয়ের কাঠ, গজাল পেরেক, ধেনো মদের বোতল। একে একে জামাকাপড় টেনে টেনে খুলছে, ছিঁড়চে, ফাঁড়চে, খাবলাচ্ছে, খোবলাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে।

—অনুরাধা, যাও শুয়ে পড়ো, তোমার ভয় নেই, আমি তোমার বন্ধু।

—আপনি শোবেন না।

—আমি এইখানেই শুয়ে পড়ব।

—কেন, আমার পাশে শুতে আপনার ঘেন্না করছে?

এই কথাটার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলুম। দরজার কাছ থেকে উঠে অনুরাধার কাছে গিয়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। নরম একটা শরীর।—আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি অনুরাধা। সেই প্রথম দিনেই পেয়ারাগাছের ডালে বসে তোমাকে ভালবেসেছিলুম। অনুরাধা মাথাটা আমার বুকে গুঁজে দিল। ঘোমটা খুলে পড়ল। টান খোঁপার দু-একটা চুল একটু আলগা হয়ে গেল। পেছন থেকে আলো পড়ে চকচক করছে। অনুরাধা কাঁদছে। চিবুকের তলায় আঙুল রেখে মুখটা তুলে ধরলুম। পানপাতার মতো মুখ। কপালের টিপে ঘষা লেগেছে। তরমুজের ফালির মতো ঠোঁট। তিরতির করছে পাখির পেটের মতো। সারা দুপুর রোদে ঘোরা তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো আমি আকণ্ঠ পান করলুম। কিছু কিছু দেখা আছে, যা মানুষ

কোনও দিনই ভুলতে পারে না। বিশ্বনাথ সরকার দু'হাতে সরলা চৌধুরীকে তুলছে। এগিয়ে যাচ্ছে। খাটে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। অসহায় সরলা পা দোলাচ্ছে। আমি দু'হাতে অনুরাধাকে মেঝে থেকে তুলে ফেললুম। অনুরাধা এক হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। সেই বিশাল খাট, মখমল ঢাকা বিছানা। এই খাটেই হয়তো কিশোরীদার জন্ম হয়েছিল।

পাপ আর পুণ্য কাকে বলে? মহারাজের কাছে ছুটতে হবে না। আমি নিজেই তার উত্তর জানি। সমাজ, ধর্ম আর সংস্কারের সমর্থন থাকলে আর পাপ হয় না। সরলামাসীও এইভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরত। আমার ভয় করত। আমি ছোট হয়ে যেতুম, কুঁকড়ে যেতুম। কানের কাছে অনবরত কেউ বলত—তারক, এ গোপনীয়, এ পাপ, এ কেউ সমর্থন করবে না। জানাজানি হলে সবাই নিন্দে করবে। যা-তা বলবে। একটা শব্দ, বিয়ে, সামান্য একটা অনুষ্ঠান, একটু সিঁদুরের ছোঁয়া, অপরিচিত একটা মেয়ে আর মেয়ে রইল না। হয়ে গেল স্ত্রী, আমি তার সর্বস্বের মালিক। সেও আমার সর্বস্বের মালিক। সমাজ আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছে।

তারক সরকারের এত প্রেম কোথায় ছিল, এত চোখের জল! যা যা হারিয়ে গেছে, সব ফিরে আসছে আজ রাতে। সব তুমি নাও অনুরাধা, দুঃখ সুখ সাফল্য অসাফল্য। কাম থেকে এই ভাবে প্রেম আসে। ধর্ষণ হয়ে ওঠে সোহাগ, আদর। অনুরাধা ফিসফিস করে বললে, কী হচ্ছে তোমার পাগলামি তুমি আমার পায়ে মাথা রাখছ কেন? মাথায় যে ভগবান থাকেন!

মনে মনে বললুম—শয়তানও থাকেন। মুখে বললুম, এমন পা আমি দেখিনি। সমুদ্রের ফেনার মতো পিচ্ছিল একটা শরীর। অভ্রের মতো চকচকে। ঘাসের মতো গন্ধ। বাতাসের মতো শীতল, শ্বেতপাথরের মূর্তির মতো গড়ন। মেঘের মতো জড়িয়ে ধরে, বিদ্যুতের মতো হাসে। যার পেটে মাথা রাখলে মনে হয় মন্দিরের বেদিতে মাথা রেখেছি। অন্ধকারে যার চোখ দেখলে মনে হয় কালো দীঘিতে নাইতে নেমেছি। যার কাছে চিরকালের মানুষের চির প্রশ্ন—তুমি কে। তুমি রাত, না তুমি দিন। তুমি উদয়, না তুমি অস্ত! নারীশরীর আমি খুব দেখেছি। উল্টে-পাল্টে দেখেছি। এ-চোখে কোনওদিন দেখিনি। প্রেমের চোখ। অপবিত্র করার চোখে দেখেছি, পূজার চোখে এই প্রথম দেখা। একটা রাতেই কি-ভাবে আমি পশু থেকে মানুষ হয়ে গেলুম।

ভোরের প্রথম আলোটা লাগল দরজার মাথার ওপর বসানো বাহারী কাঁচে

পাশের ঘরে কিশোরীদার হাঁটাচলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কী একটা রাগ ভাঁজছে ভরাট সুরেলা গলায়। দরজা খুলে আমরা দু'জনেই বেরিয়ে এলুম। কিশোরীদা একটা স্যুটকেস গুছোচ্ছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল—বাঃ বেশ মানিয়েছে। দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেছে তো!

—তুমি ভোরবেলা স্যুটকেস গুছোতে বসেছ!

কিশোরীদা স্যুটকেস ফেলে গাইতে লাগল,

আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয় পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে—
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥

চোখের কোনায় একটু জল। আকাশে ফটফট করছে সকাল। কিশোরীদা বললে, আমার সামনে দু'জনে বোস। সকালের আলোয় ভাল করে দেখি।

—তুমি কি কোথাও যাচ্ছ?

—তা হলে শোন, একটা গল্প বলি। কোনও এক মায়ের কাহিনী। সুন্দরী। সেকালের মানে শিক্ষিতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। আর সেই মায়ের স্বামী ধনী। স্বভাবটা ছিল মৃদু। উদার। লোকে বলত স্ত্রৈণ। যথেষ্ট লেখাপড়া জানতেন। ছবি আঁকতে পারতেন। গান-বাজনার ভক্ত ছিলেন। অর্গান বাজিয়ে রবীন্দ্রসংগীত করতেন। লেখার বাতিকও ছিল—গল্প, কবিতা। তাঁকে ঘিরে রেখেছিল স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী একদল চাটুকার। বড়লোকের যা হয়। এই দলের কয়েকজনের লক্ষ্য ছিল ওই সুন্দরী মহিলার ওপর। এর মধ্যে একজন ভাল সেতার বাজাতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মহিলাটিকে নিয়ে সরে পড়ার। কর্তামশাই স্বল্পায়ু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভূতের নৃত্য শুরু হল। একা মহিলা সামলাতে লাগলেন সব দিক। মহিলার চরিত্রে কোনও দুর্বলতা

ছিল কি না, যে এই কাহিনী বলছে তার জানা নেই। তবে অনেক পুরুষের আসা যাওয়া ছিল সেই বাড়িতে। মহিলা তাদের কাজে লাগাতেন। একের পর এক মামলা। মামলা সামলাতে জলের মতো টাকার খরচ। কিছু কিছু ক্ষমতাশালী মানুষকে রূপের চটকে ভোলাবার চেষ্টা। মহিলার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল—ছেলে। ছেলে বড় হবে, মানুষ হবে, বিলেত যাবে। ছেলে কলেজে ভর্তি হল, মদ খেতে শিখল, মেয়েদের সঙ্গে ঘুরতে শিখল। প্রেমে পড়ল এক বেশ্যার। মহিলার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। একদিন সেই ছেলে বলে বসল—চরিত্রের বড়াই কোরো না। বয়েস যখন ছিল, তখন তুমি কি না করেছ ! তোমার জন্যেই তো বাবা মারা গেলেন। সাতদিনের মধ্যে মহিলা সব ছেড়ে চলে গেলেন কাশী। ছেলে আর কোনও খবরই রাখল না। মনে মনে মায়ের চরিত্রে কালির পোঁচ মাখাতে মাখাতে, ঘৃণার পর্দা ফেলতে ফেলতে এমন একটা ব্যবধান তৈরি করে ফেলল, যেন তার মা বলে কেউ ছিলই না। একদিন খবর এল দশাশ্বমেধ ঘাটে পড়ে গিয়ে সেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। চলে যাওয়ার পর মানুষের মূল্য বাড়ে। বেঁচে থাকার তিক্ততা ঘুচে যাওয়ার পর প্রকৃত রূপ দেখা যায়। মানুষটি তখন চলে গেছে সমস্ত অনুশোচনার উর্ধ্বে। তখন আর ক্ষমা চাইবার, সেবা করার অবকাশ থাকে না। থাকে শুধু প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ। জীবনে কিছু অপরাধ থাকে তারক যা জীবন দিয়ে শোধ করতে হয়। সেই মায়ের মৃত্যুদিন এসে গেল। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে দাঁড়াব। ওই কি সেই পইঠা, যেখানে আমার মা মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন। পাথরে লেগে কপাল ফেটে গেছে। লোকে জল দিচ্ছে মুখে। কাঞ্চনবর্ণা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে একটা মুখ খুঁজছেন। তাঁর ছেলের মুখ। ছেলে তখন লাল পাড়ায় মদের বোতল খুলে মেয়েমানুষের কোলে উঠে বসে আছে। তারক, নিঃশ্বাস বাতাসে পড়ে, আপশোস কোথায় পড়ে ? অন্তরে। আগুনের হলকার মতো। ভেতরটা পুড়ে যায়। অনুরাধা, তুমি একটু চা করবে মা। আমাকে সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতে হবে।

—ক'দিনের জন্যে যাচ্ছ শুনি !

—কয়েকদিন। তুই এখন তৈরি হয়েছিস। তোর ওপর নির্ভর করা যায়। ঘোষ ডাক্তারের গাড়ির মোবিলটা চেক করে ডেলিভারি দিয়ে দিস। নতুন কোনও গাড়ি সার্ভিসে এলে ফেরত দিবি। ছোটখাট মেরামতির কাজ করে দিস। এই বাড়িতেই তোরা হনিমুন কর। চাবিটাবি সব রইল, সাবধানে থাকিস। কোনও বিপদ এলে চম্পার সাহায্য নিস। যাও, দেখছ কী ! চা

চাপাও। উনুন নেই মা, স্টোভ আছে—

আমার মনের কোণের বাহরে
আমি জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে ॥
কোন্ অনেক দূরে উদাস সুরে
আভাস যে কার পাই রে—
আছে আছে নাই রে ॥
আমার দুই আঁখি হল হারা,
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা
কার ছায়া আমায় ছুঁয়ে যে যায়,
কাঁপে হৃদয় তাই রে—
গুন্‌গুনিয়ে গাই রে ॥

অনুরাধাকে গান শেখাস। ওর ভেতর গান আছে।

—তোমাকে যেতেই হবে? আমাদের ফেলে চলে যাবে?

—ডাক এসেছে, আমার সে-দেশ থেকে, বিদায় নেব একটিবার শুধু তোমায় দেখে।

ঘণ্টাখানেক পরেই কিশোরীদা স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে চলে গেল। পেছন ফিরে একবার তাকালও না।

॥ সাত ॥

তারক সরকারের সংসার হল। তারক সরকারের প্রেম এল। অনুরাধা চান করে চুল ঝাড়ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। চান করে পাখি যখন ডানা ঝাড়ে, সেই দৃশ্য দেখলে যেমন মনে হয়, জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়, সেইরকম একটা ঘোর লাগছে চোখে। পিঠের দিকটা চওড়া হয়ে ঢালু কাঁধে গিয়ে মিশেছে। শক্ত কোমর গোল হয়ে নেমে গেছে গোড়ালির দিকে। ইঁট রঙের নতুন তাঁতের শাড়ি কোমল শরীরে খড়খড় করছে। এই আমার বউ। শেষ পর্যন্ত তারক সরকারের মতো এক পাপী বাজি জিতল। খুব যত্নে রাখতে হবে এই বউকে। রোদে পোড়ানো, জলে ভেজানো চলবে না। আমার মা দেখতে পেল না এই যা দুঃখ। লোকে মনে করে খুনীর ছেলে খুনী হবে, পাগলের ছেলে পাগল, সাধুর ছেলে সাধু, ডাকাতের ছেলে ডাকাত। এইবার সকলের চোখ ঠিকরে যাবে। আই অ্যাম তারক সরকার, কার মেকানিক।

গাড়ির শব্দ শুনে বলে দিতে পারি, অসুখটা কী ! এম. এ. বি. এ হল না ; কিন্তু বিয়েটা কেমন হল ! আর রোজগার ! যত লেবার দোবো তত চাঁদি আসবে। মাই নেম ইজ তারক সরকার। লোকে আমাকে কড়ি কপালে বলে হিংসে করে।

অনুরাধা বললে—কিশোরীদার তো রান্নাঘর বলে কিছু নেই। উনুন চাই কড়া চাই, চাটু চাই, থালা, বাটি, হাতা খুন্তি সবই তো চাই।

—সব তো বাড়িতে আছে, চলো নিয়ে আসি। একটা গাড়ি নিয়ে যাই। সব বোঝাই করে নিয়ে আসি।

—এই বাড়িতেই কি চিরকাল থাকবে ?

—না, তা কেন ? কিশোরীদা এলেই আমরা চলে যাব।

—তা হলে রান্নাটা ও-বাড়িতেই হোক, শোয়াটা এ-বাড়িতে।

—তুমি সারা দিন একা একটা বাড়িতে থাকবে !

অনুরাধার মুখ শুকিয়ে গেল। বারান্দার ওপাশ থেকে আমার পাশে চলে এল। পুরনো কথা মনে পড়ে গেছে। কালু কালোয়ার, ফকির, সনাতন, নিতাইও হয়তো ছিল। অন্ধকারে তাদের চোখ জ্বলছে নেকড়ে বাঘের মতো। অনুরাধা কেমন যেন হয়ে গেল। যেন, আবার তারা তেড়ে আসছে।

—ভয় নেই অনুরাধা। তোমাকে একা রেখে আমি কোথাও যাব না। ভয় আমারও আছে। তোমাকে আমি পেয়ে হারাতে চাই না, তা হলে আমি আর বাঁচব না। রান্না এইখানেই হবে। তোমাতে আমাতে যাই চলো। তুমি দেখেশুনে সব আনবে।

—আমি বলব, তুমি একসেট নতুন কেনো। কিশোরীদার কাজে লাগবে। একটা তোলা উনুন, দুটো স্টিলের থালা, বাটি, গেলাস, একটা পেটা কড়া। তুমি আমাকে নিয়ে চলো, সব গুছিয়ে আনছি।

—চলো। এ বাজার থেকে কিনব না। আমরা নতুন বাজার থেকে কিনব।

—একটু সাজব ?

—একেবারে না। তুমি বেশি সাজলে তোমাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কালুর দলের কেউ কেউ বদলা একটা নেবেই। আমার মন বলছে।

নতুন বাজারে অনুরাধাকে ছেড়ে দিলুম—নাও কি কিনবে কেনো।

অত জিনিসপত্র, তার মাঝে অনুরাধা। মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সংসার মেয়েদের স্বপ্ন। সাজাবে, গোছাবে, কাটবে, কুটবে, বেলবে, বাটাবে।—তোমার যা মন চায় কেনো। আমার কাছে অনেক টাকা। চুরির টাকা নয়, মেহনতের টাকা। অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি। বড় থেকে ছোট হতে হতে ওপর দিকে উঠে গেছে। ঝকঝকে থালা। বড়, ছোট কৌটো। গেলাস, বাটি। অনেক সংসার যেন এক জায়গায় এসে জমেছে। অনুরাধা এপাশে যাচ্ছে, ওপাশে যাচ্ছে। দোকানদারও মুগ্ধ। দোকানের বাইরে শীতকালের কমলালেবু রঙের রোদ। শহরের উত্তাপ কমে যাওয়ায় মানুষ বেশ খুশি খুশি। ট্রাম যাচ্ছে ময়দানের দিকে মন্থর গতিতে। এখন সব চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সময়। ছেলেদের ময়দানে ক্রিকেট খেলার মরশুম। অনুরাধা ক্লান্ত হয়ে উঁচু একটা টুলে উঠে বসেছে। ফর্সা বুকে ছোট্ট একটা লকেট দুলছে। কানের গোল রিঙ দুটো যেন কথা বলছে। দুলে দুলে। দোকানদার হিন্দুস্থানী চা আনিয়ে আমাদের খাওয়ালেন। রাজস্থানের মানুষ বেশ হাসিখুশি, আলাপী লোক। অনুরাধাকে বললেন—এই হাতে মেহেন্দি বেশ মানাবে। আমাদের মেয়েরা অনেক ডিজাইন জানে। খালি দুটো প্যাকিং বাক্সে আমাদের মাল প্যাক হয়ে গেল। দশটা একমাপের কৌটো কেনা হল। রান্নাঘরের তাকে পাশাপাশি থাকবে। চা, চিনি, মশলা, সুজি। আমি একটা ট্যাকসি ধরে আনলুম। ট্যাকসিতে উঠে একেবারে আমার গা ঘেঁষে বসে বললে—উঃ, কত জিনিস বলো, সব নতুন, ঝকঝক করছে। আমি নিজে হাতে মাজব, কারও হাতে দোবো না। তোমার অনেক খরচ হয়ে গেল!

—একটা গাড়িকে হাঁ করাব, ঝর ঝর করে টাকা পড়বে!

—তা হলে, আইসক্রিম খাওয়াবে!

—কটা আইসক্রিম খাবে তুমি ?

—বেশ বড় একটা, সব ফলটল দেওয়া থাকবে।

—চলো, সাউথ-এ যাই, বেশ ভাল একটা জায়গায় গিয়ে জমিয়ে খাব। আজ আমাদের দিন।

সারাটা দিন আমরা ঘুরে বেড়ালুম। কলকাতার সব স্বপ্নময় জায়গা। অনুরাধা কখনও আমার কাঁধে মাথা রেখে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তার হাতের মুঠোয় আমার হাত। কখনও সামনে ঝুঁকে পড়ল। বলতে লাগল, সব কেমন সত্যি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সিনেমা হচ্ছে। একসময় আমরা ফোর্টের পাশ দিয়ে, পশ্চিম গঙ্গায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে ফিরে এলুম।

অনুরাধার নতুন উনুনে আগুন পড়ল। ভুস্‌ভুস করে ধোঁয়া উঠছে

আকাশের দিকে। অন্ধকারে গ্যারেজের টিনের চালাটা অদ্ভুত সাদা দেখাচ্ছে। গাড়ির ভাঙা বডি পড়ে আছে। গোটাকতক বড় ড্রাম। একখণ্ড খোলা জায়গায় উনুনটা। এলোমেলো ধোঁয়া। বাতাসে শীত শীত। বসে আছি চুপ করে। মনে হচ্ছে, কলকাতার বাইরে বেড়াতে এসেছি। এই দিকটা বড় ফাঁকা। কিছু দূরে ঝিল। হিন্দুস্থানী বস্তি। বাড়িটার ভাঙা অংশ। কিট্‌কিট্ করে পোকা ডাকছে নানারকম। চিলের ছাতে পেঁচা ডাকল তিনবার। অনুরাধা নিজের মনে দালানে বসে রাঁধছে। গনগনে আগুনে মুখটা যেন পেতলের মুখ।

কিশোরীদা নেই। আমার সবচেয়ে প্রাণের বন্ধু মাধাই নেই। নিতাইটার চোখ থাকবে না যাবে, বোঝা যাচ্ছে না। হেড মেকানিক দাসবাবু আর তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট বলাই কাজ সেরে চলে গেছে। চারপাশ থেকে ভীষণ একটা ভয় চেপে আসছে। রাতের শিকারী জন্তুর মতো আমার চোখ জ্বলছে। বেশি সুখ কি সহ্য হবে! অসুখটাই তো আমার সুখ। অনুরাধা দু'বার তাগাদা মেরেছে—বাইরে হিমে বসে থাকার মানেটা কী। অসুখ হলে কী হবে! অনুরাধা জানে না আমি কেন বসে আছি। পাহারাদার, চৌকিদার। যদি তারা আসে। কিছু দূরেই ঘাসের ওপর একটা স্প্যানার পড়ে আছে। ওটা দিয়ে অনুরাধাকে বাঁচাতে পারব। হিন্দুস্থানী বস্তির দিকে পালানো যাবে না। মাঝে ঝিল। রাস্তা ধরে সাত মিনিট হাঁটলে প্রথম দোকান বৈশালী। সেইটুকু যেতে যেতেই ওরা টুকরো টুকরো করে দেবে। কালো বিশাল গেটটা বন্ধ। দু'পাশে দুটো কনকচাঁপার ঢ্যাঙা গাছ। পেঁচাটা আবার ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। কিশোরীদা বলত, ও আমার লক্ষ্মী পেঁচা। অনুরাধা লুচি ভাজছে। একাই বেলছে, একাই ভাজছে। অনুরাধা লুচি ভালবাসে। বাতাসে সুরেলা গন্ধ।

সব দোরতাড়া বন্ধ করে আমরা ঘরে এলুম। পাথরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে খোঁপাটা এলো করে মাথাটা দু-তিনবার ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকালো। চুল ভেঙে পড়ল পিঠের ওপর। ঘাড়ের কাছের চুল বাঁ হাতে মুঠি করে ধরে একটু উঁচুতে তুলে ঘাড়ের কাছটা আঁচল দিয়ে মুছল। অনেকক্ষণ একভাবে আগুনের কাছে বসেছিল।

—আমার রান্না কেমন ?

—চমৎকার।

—পেট ভরে খেয়েছ তো !

—পেট ভরে ? পেট ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

—মায়ের কাছে রান্না শিখেছি। কিছু উল কিনে দিও তো। তোমাকে একটা সুন্দর সোয়েটার বুনে দোবো।

—দোবো। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একজন কাজের লোক দরকার।

—দু'জনের সংসারে আবার কাজের লোক!

অনুরাধা চুলের ফিতে খুলে একটা আলগা খোঁপা করল। ভেতরের জামাটা খুলে রেখে দিল। লেপের তলায় ঢুকে বললে—কী আরাম। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। শীতটা বেশ জাঁকাচ্ছে। দূরে, ঝিলের ধারে কুকুর কাঁদছে। অনুরাধা দু'হাতে আমাকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরল। ভয়, ভীষণ ভয়! ওই বুঝি আসছে তারা!

—কুকুর কাঁদছে কেন গো!

—কুকুর তো রোজই কাঁদে মানুষের অবস্থা দেখে।

অনুরাধা আরও গভীর হয়ে এল আমার শরীরের সঙ্গে। আমার ভেতরে সে ঢুকে পড়তে চাইছে। দূরে একপাল কুকুর, যেদিকটায় হিন্দুস্থানী বস্তি, সেদিকটায় বুকফাটা কান্না কাঁদছে। ওরা অনেক কিছু দেখতে পায়, যা মানুষ দেখতে পায় না। অনেক সময় আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমরা দিন দিন কতটা উচ্ছন্নে যাচ্ছি।

ঘরটা আমাদের তুলনায় বিশাল বড়। বড় মানেই ভয়। থইথই অন্ধকারে একটা ভেলায় ভেসে আছে দুটি প্রাণী। মনে হচ্ছে কিশোরীদার মা ছবি থেকে নেমে এসে বলছেন—তোরা কে? কেন এসেছিস আমার ঘরে। বাইরে অত বড় একটা দালান। দৌড়ে চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সেখান থেকে পাক মেরে পশ্চিমে। এই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার কথা ভাবা যায় না। ওখানে কিশোরীদার অশরীরী পূর্বপুরুষরা পায়চারি করছেন। কিশোরীদা কি শাস্তি দিয়ে গেল। দিনের বেলা বুঝিনি। বুঝছি এই গভীর রাতে।

কুকুরগুলো বাড়িটার পোড়ো অংশে চলে এসেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে হুউউ করে কাঁদছে। মনে হয় ওরা কারোকে অনুসরণ করে আসছে। কালু কালোয়ারের প্রেতাত্মা। এক চোখো নিতাই। হাত ভাঙা ফকির। ধার্মিক চম্পা। অন্ধকারকে যারা খুব ভাল চেনে তাদেরই কেউ ঝিলের ওপার থেকে এপারে এসে গেছে। বাইরের দালানে হাঁটু ভাঙার শব্দ। অস্পষ্ট খস্‌খস্‌। বিছানায় দু'জনেই উঠে বসলুম। অনুরাধা দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। দরজার মাথার ওপর কাঁচে একটা আলোর আভা ফুটেই মিলিয়ে

গেল। অনুরাধা থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত জানলা বন্ধ। একটা ঝিঁঝি পোকা অবিরাম ডেকে চলেছে। গ্যারেজের চালে একটা ইট পড়ল।

অনুরাধা বললে—ওরা এসে গেছে। ওরা ধরার আগে তুমি আমাকে মেরে ফেল।

---মরলে, দু'জনেই মরব। আমি আজ একটা ছুরি কিনেছি।

আমরা কাঠ হয়ে দু'জনে বসে আছি। মাঝরাতের মেঠো ঠাণ্ডা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা তাকিয়ে আছি দরজার দিকে। খোলবার চেষ্টা করলেই স্প্যানারটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। সেটাকে ঘাস থেকে তুলে এনে মাথার কাছে রেখেছি। ফাইট একটা দোবোই। ঘরের দেয়াল ঘড়ির স্প্রিং-এ খড়ড় করে একটা শব্দ হল। তিনটে বাজল। শীতকাল, দিনের আলো ফুটতে এখনও পাক্কা তিন ঘণ্টা। অনুরাধা ঘড়ির শব্দে চমকে উঠে আরও জোরে আমাকে জড়িয়ে ধরল। মনে হল, পশ্চিমের জানলার বাইরে কেউ শিস দিল।

এক সময় মনে হল, এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কোথাও ভোরের একটা পাখি ডাকল। সে যে কী সান্ত্বনা! দুটো শরীর শিথিল হয়ে এল। পাখি যখন ডেকেছে, তখন পাখি দিন দেখতে পেয়েছে। আমাদের আতঙ্কের রাত শেষ হয়ে এল। পাখিটা আরও দুবার ডাকল। কোনও ছোট পাখি। খুব কচি গলা। আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লুম। যেন আমরা একটা মানুষ, দুটো রুটির মতো সেঁটে গেছি।

খুব আলো এসে আমাদের যখন জাগাল, তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। তখনও দরজা খুলতে ভয় করছে। যদি কেউ থাকে। দরজা অল্প ফাঁক করে বাইরে তাকালুম। কেউ কোথাও নেই। ধবধবে সাদা দালান। দু'জনে বেরিয়ে এলুম। দালান থেকে রক। রক থেকে জমি, মাঠ, বাগান, গ্যারেজ। কাল খুব শিশির পড়েছিল। গ্যারেজের কাছে একটা বেল পড়ে আছে। এই বেলটাই কাল টিনের চালে পড়েছিল। অনুরাধা আনন্দে একটু ছুটে নিল। বেঁচে যাওয়ার আনন্দ। একটা খাঁচায় অনেক মুরগী। রোজই কিছু ভোগে যায়। যে কটা বেঁচে গেল গেল। আবার একটা দিন ক্যাঁচোর ম্যাঁচোর, খুঁটে খুঁটে খাবার খাওয়া। আমাদেরও সেই অবস্থা। দু'জনে খুব ছোটাছুটি করলুম। অনুরাধা বললে, কী সুন্দর লাগছে, যেন স্বর্গে আছি।

দিন একটু গড়াতেই মনে হল—আজ রাতে আর এ বাড়িতে থাকা যাবে না। মানুষের ভেতর থেকে বলে দেয়, কোন জায়গাটা নিরাপদ আর কোন জায়গাটা নিরাপদ নয়। শুনলে ভাল না শুনলে মরবে। বড় বিপদে ফেলে

গেল কিশোরীদা। রাতে বাড়ি পাহারা দেবে কে! এত জিনিসপত্তর। ওদিকে অনুরাধাকে ও বাড়িতে রাখলে, তাকে কে পাহারা দেবে রাতে।

তারক সরকার জীবন যদি অত সহজই হবে তাহলে বেঁচে থাকার আনন্দটাই যে থাকে না! গোলাপে তাহলে কাঁটা থাকত না। লঙ্কা তাহলে ঝাল হত না। দাসবাবুকে বললুম, রাতে এ-বাড়িতে থাকুন না। তিনি বললেন, মাল খেয়ে রাতে ভদ্রলোকের বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি করব সেটা ভাল হবে! তুমি বলাইকে বলো। বাড়িতে ওর জায়গা হয় না। রাজি হয়ে যাবে। বলাই বললে, রাতে যে আমি একটু তবলা সাধি, তোমাদের অসুবিধে হবে না তো।

বলাই এসে গেল ধুমসো একজোড়া তবলা নিয়ে। বলাই খুব ডাকাবুকো সাহসী ছেলে। নেশাভাঙ করে না। একটা দুশ্চিন্তা গেল। কিশোরীদার ঘরের মেঝেতে তার বিছানা হবে। খেলাটা জমে গেল রাত দশটার পর। শুরু হল বলাইয়ের তবলার রেলা। বাঘের মতো হাত। মুখে বোল বলছে, আর হাতে খই ফুটছে। কৎ তা গদি ঘেনে ধা। সারা বাড়িতে তবলার বোল দামাল এক পাল শিশুর মতো ছোটাছুটি করছে। তা ধিন্ ধিন্ তা। অনুরাধা-রাঁধছে। বলাইও খাবে। বলাইয়ের খাবার চাপা থাকবে। সাধনা শেষ হলে খাবে, সে কখন কে জানে। বলাই আহম্মদজান থেরকুয়ার মতো তবলিয়া হবে। তার হাতে না কি গুপোর কাজ খুব ভাল খোলে—গুপ্‌গুপাগুপ। গবগবাগব। রাত বারোটা, বলাই থামে না, রাত একটা বলাই খেপে গেছে। মাঝে মাঝে তবলা ছেড়ে ঘরের মেঝেতে পঞ্চাশ-ষাটটা ডনবৈঠক মেরে নিচ্ছে। তারপর আবার তবলা। সে এক প্রলয় কাণ্ড। গলগল করে ঘামছে। মুখচোখের চেহারা অন্যরকম। থামার কথা বলতে গেলে আমাকেই তবলা করে দেবে। তালের এমন মজা, আমাদের সব কিছুতে একটা তাল এসে গেল। হাঁটা, চলা, খাওয়া, শোয়া। সব তালে তালে। একটা মানুষ তবলার ভেতর এমনভাবে ঢুকে যেতে পারে—না দেখলে বিশ্বাসই হত না।

তারক সরকার আমার নাম, লোকে আমাকে গুছাইত বলে। আমি কিছুই গুছোই না। ভাগ্যই আমার সব গোছগাছ করে দিয়েছে। একদিকে কেড়ে নিয়েছে আর একদিকে ভরে দিয়েছে। সেই কিশোরীদার বুড়োর গল্পের মতো। যে রোজ একটা না একটা উপহার নিয়ে বেশ্যাবাড়ি যেত। শেষের দিনের গোলাপফুল নর্দমায় পড়ে গেল—বললে, কৃষ্ণায় নমঃ। যমালয় থেকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাওয়ার সময় ভগবান বললেন, আমিই তোমাকে দিয়ে সব করিয়েছি। বেশ্যাসক্ত করিয়েছি, কৃষ্ণায় নমঃ বলিয়েছি। যমরাজের বাগানে

গোলাপ ফুল কেটে কেটে ফেলার বুদ্ধি জুগিয়েছি। সবই আমি করিয়েছি, তুমি করেছ। বুদ্ধি আমার, কর্ম তোমার।

বলাই দাসও আমার অনেক গুরুর এক গুরু। একদিন, দু দিন নয়, তিন তিনটে বছর কিশোরীদার পাত্তা নেই। না চিঠি, না খবর। আমি, বলাই, অনুরাধা, অনুরাধার মা, চারজনে কাশী গেলুম। বাঙালিটোলার কাছে একটা হোটেলে উঠলুম আমরা। মন্দির, মসজিদ, আশ্রম, ঘাট, কোনও জায়গাই খোঁজার বাকি রইল না। সবাই আছে, কিশোরীদা নেই। সকাল, বিকেল বসে রইলুম মন্দিরে। সাধু-সন্ত, ভক্ত, ভণ্ড, সবাই এল গেল, কিশোরীদার মতো একজনকেও মনে হল না। দোকান, হোটেল সব অনুসন্ধান করা হয়ে গেল। কেউ আসেনি ওই নামে। এক প্রবীণ বাঙালি ভদ্রলোক বললেন—বিন্ধ্যেশ্বরী মায়ের কাছে খোঁজ করো, কলকাতার সন্ন্যাসিনী। অনেক দিন কাশীতে আছেন। খুব শক্তি তাঁর। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে তাঁর ছোট্ট ডেরা। দেখলে মনে একটা ভাব আসে। কিশোরীদার ঘরের দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার আছে। মহাপুরুষের মুখের ছবি, তার তলায় ইংরিজিতে বড় বড় করে লেখা আছে—

LO, We have looked upon the face of God,
Our life has opened with divinity.

বিন্ধ্যেশ্বরী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সেই কথাই মনে হল। দেবীর মতো মুখ। মনে হল, বয়েসকালে অনুরাধার মুখেও ওইরকম একটা ভাব আসবে। পাথরের মেঝেতে আমরা বসে পড়লুম। ঘরটা গুহার মতো। বেশ ঠাণ্ডা। ঘরে একটি শিবলিঙ্গ ছাড়া কিছুই নেই। সুন্দর একটা গন্ধ। আমরা প্রণাম করতে গেলুম, প্রণাম নিলেন না। অনুরাধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সংসারে ঢুকলি কেন ? তুই তো হরিণ। বাঘে ধরবে যে। বেশি রূপ থাকলে সংসার করতে নেই। মদনের অভিশাপ। 'মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি !' কে শুনেছিলেন ! 'শুনি তাই আজি।' রবীন্দ্রনাথ।

'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব—এ প্রহসনের
মধ্য-অংকে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের

ঘরটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠল—সাবধানে থাকিস মেয়ে, যুগটা খুব খারাপ

পড়েছে।

কিশোরীদার একটা ছবি দেখিয়ে বললুম—মা, ইনি কি কখনও এসেছিলেন আপনার কাছে ?

—এ তো কিশোরী ! একবার কেন অনেকবার এসেছে। কিশোরীর মা তো আমার কাছেই থাকত।

—শেষ কবে আপনার কাছে এসেছিলেন ?

—তা হবে, বছর তিন হল। তিন চার দিন ছিল আমার কাছে। সে তো আমার ছেলের মতো।

—তিন বছর নিরুদ্দেশ।

—তখনই দেখেছিলুম কড় ধরেছে। কড় ধরা জানো ? দু'চার পাত্তর মদ পেটে পড়লে, চোখ লালচে হয়, অল্প অল্প নেশার আমেজ, একেই বলে কড় ধরা। কিশোরীর মনে সেই ভগবৎ নেশা ধরেছিল। ভারতবর্ষ ভক্তের দেশ, ভক্তির দেশ। ডাকাবুকো ছেলে। দেখো কোথায় নিজেকে হারিয়েছে।

—আপনি কিছু বলতে পারেন, কোথায় গেলে দেখা পাব ?

—না, বাবা, সে আমি বলতে পারব না। আমার সে ক্ষমতা নেই।

আমরা হতাশ হয়ে উঠে এলুম। ফিরে এলুম কলকাতায়। কিশোরীদার কত কী হতে পারে—কিশোরীদার কোনও দুর্ঘটনা হতে পারে, কিশোরীদা আত্মহত্যা করতে পারে, কিশোরীদা সন্ন্যাসী হতে পারে—এটা যেন বিশ্বাস হয় না। তবু যা হয়েছে তা তো হয়েইছে। বলাই বললে, তাহলে এই ভূতের সম্পত্তি আগলে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তুমি খেটেখুটে করবে, আর কোনও এক শরিক এসে পেছনে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। এইসব বনেদী বংশের অনেক কাজিয়া আছে। এসব নিজের নামে কোনওদিন করতেও পারবে না, তোমার হাতে কোনও কাগজ নেই। চেক এলে তুমি ভাঙাতে পারবে না। এ কারবার করে লাভ কী ! দু'জনে মিলে অনেক জল্পনা-কল্পনা হল। এ সম্পত্তি তাহলে কার ! কিশোরীদার কেউ না থাকলে, এ-সম্পত্তি সরকারের। সব ফেলে রেখে আমরা যাই কী করে। কোথায় দলিল, কোথায় পরচা, দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বর। চোদ্দ বছর না গেলে একজন মানুষকে মৃত বলা যাবে না।

গ্যারেজটা শেষ পর্যন্ত বন্ধই হয়ে গেল। স্মৃতি হিসেবে পড়ে রইল একটা ভাঙা মটোর গাড়ি। বলাই দাস বললে, দেখবে, একদিন সব দখল হয়ে যাবে এত বড় একটা সম্পত্তি। যায় যাবে, আমরা আর কী করতে পারি।

তবে সহজে দখল ছাড়া হবে না। বাড়িটায় তবলার বোল খুব খেলে ভাল, যেন একশো নর্তকী নাচছে। একটা কিছু করতে তো হবে। পেট চলবে কী করে!

বলাই বললে—ভাই, আমার দু'হাতের দশটা আঙুল ছাড়া কোনও মূলধন নেই।

—আমার একটা বাড়ি বেচে দি।

—তারপর?

—তারপর, যে কাজটা আমরা জানি, সেই গ্যারেজের কাজই শুরু হোক।

—তারক! মিস্ত্রীর লাইনটা ভাল নয়। তেল-কালি-মোবিল- ডিজেল। লোকে রেসপেক্ট করবে না। ছেলে, মেয়ে মানুষ হবে না। মেয়ের ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারবে না। লোকে বলবে, তারক মিস্ত্রী।

বেশ কিছুদিন ভাবনাচিন্তা চলল। বলাই মাঝরাতে তবলা সাধে। আমি আর অনুরাধা পরামর্শ করি। যত রাত বাড়ে তত লোভ বাড়ে। এত বড় একটা সম্পত্তি হাতের মুঠোয় এসে চলে যাবে। গ্যারেজের ব্যবসা খুব লাভের। মিস্ত্রী তা কী হয়েছে! সমাধানে আসার আগেই আমরা ঘুমিয়ে পড়তুম। বলাইয়ের তবলার বোল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের মতো ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে যেত।

অনুরাধা হঠাৎ একদিন বললে—বলাইদার মতো তবলাটাকে বেশ একটু টানটান করে বাঁধো না। ঢ্যাব ঢ্যাবে হয়ে যাচ্ছ কেন? পরের জিনিসে লোভ কেন? নিজে উপার্জন করো। এই সম্পত্তিটার ওপর এত নির্ভর করছ কেন। দেখার কথা দেখো। এখানে নতুন কিছু না করাই ভাল। নতুন কিছু করতে হলে অন্য কোথাও, অন্য কিছু করো। নতুন ভিতের ওপর দাঁড়াও।

এক উপদেশেই তারক সরকারের জীবন ঘুরে গেল। সেদিন সন্ন্যাসী মহারাজ বলেছিলেন—স্ত্রী হলেন শক্তি। বিদ্যা আর অবিদ্যা দুইই আছে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী-কাঞ্চন মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া জ্ঞান, প্রেম। অবিদ্যাকে প্রসন্ন করলে, বিদ্যার আবির্ভাব। মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। তাই শক্তির পূজাপদ্ধতি। দাসীভাব, বীরভাব, সন্তানভাব বীরভাব মানে রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাংলাদেশে জাঁতি থাকে—অর্থাৎ ওই শক্তিরূপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন করবে। অনুরাধা আমার সেই মায়াপাশ ছেদন করে দিল। বলাই কোথা থেকে খবর নিয়ে এল—সাত আট বছর কোন

একটা জায়গায় বসবাস করলে অধিকার জন্মে যায়, তখন আর তাকে সে জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা যায় না। দরকার কী অত সবে। যা আছে থাক, আমরা সরে যাই।

যে আলমারির জিনিস কিশোরীদা অনুরাধাকে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা খোলা হল। অনুরাধা টেনে টেনে সব নামাচ্ছে। অনেক শাড়ি। কিশোরীদার মায়ের আমলের জিনিস। কিছু পিঁজে গেছে। একটা গয়নার বাক্‌সো। তার মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। একটা হার। গোটাকতক আংটি। সোনার জেল্লা কমে গেছে। সোনার ফ্রেমের ভারী পাওয়ারের একটা চশমা। লেডিজ শাল। পোকায় ফুটোফুটো করে দিয়েছে। একটা ছোট্ট খাতা বেরল। কিশোরীদার হাতের লেখা। অনেক কিছু লেখার মধ্যে একটা নাম ঠিকানা পাওয়া গেল—পরেশনাথ ভট্টাচার্য, প্লিডার, গ্যালিফ স্ট্রিটের ঠিকানা।

আমি আর বলাই খুঁজে খুঁজে সেই ঠিকানায় গেলুম। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাইরের ঘরে এক তরুণ বসে আছেন, সামনে কয়েকজন মক্কেল। চতুর্দিকে আইনের বই। ভদ্রলোক পরেশবাবুর ছেলে। বাবা অসুস্থ। সন্ধের পরেই বিছানায় চলে যান।

—আমরা যে একটা পুরনো মামলার খোঁজে এসেছি। দু'চারটে কথা যে বলতেই হবে।

—কার মামলা ?

—কিশোরী ঘোষ। একবার দেখা করিয়ে দিন। বড় বিপদ।

উত্তর কলকাতার এঁদো বাড়ি। নোনাধরা দেয়াল। ড্যাম্পড্যাম্প গন্ধ। আমাদের একটা ভেতরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। বিশাল উঁচু চৌকাঠ। একটা আসন ছেঁড়া পাপোশ। মাঝারি মাপের ঘর। ফার্নিচার ভরাট। দেয়াল ঘেঁষে একটা জামদানী খাট। সেই খাটে বালিশে পিঠ রেখে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। ভীষণ ফর্সা। মুখে একটাও দাঁত নেই। গাল দুটো অদৃশ্য। মুখে কী একটা চিবোচ্ছেন। আমি আর বলাই দু'জনে দুটো মোড়ায় বসলুম। ঘরের আলোটার তেমন তেজ নেই। দেয়ালে মাকালীর মস্ত বড় একটা ছবি। পাখার বাতাসে ক্যালেন্ডারের ছবিটা অল্প অল্প দুলছে।

বৃদ্ধ আমাদের দেখে বললেন, এরা কারা ? চিনতে পারছি না তো। চোখে কম দেখি।

—আমাদের চিনবেন না। একটা পুরনো মামলার ব্যাপারে এসেছি।

—মামলা ! মামলা, মকর্দমা আমি আর করি না বাবা। এখন আমার

ছেলেই সব করে।

—মামলা আপনাকে করতে হবে না।

—তবে এসেছ কেন?

—আপনি দত্তবাগানের কিশোরীমোহন ঘোষকে চিনতেন?

—কিশোরী মোহন। হ্যাঁ চিনতুম। চিনতুম কেন, এখনও চিনি।

—তাঁর বিষয় সম্পত্তির দলিল, উইল কিছু আছে?

—তোমাদের বলব কেন?

—এই জন্যেই বলবেন, আজ তিন বছর তিনি নিরুদ্দেশ। আমরা তাঁর সম্পত্তি, গ্যারেজ সব সামলাচ্ছি। আর পারছি না। যদি কোনও ওয়ারিসান থাকে বলুন, তাঁর হাতে সব দিয়ে আমরা চলে যাই।

—তিন বছর বললে? হ্যাঁ তিন বছরই হবে। তিন বছর আগে সে উইল করে তার সমস্ত সম্পত্তি মেয়েকে দিয়ে গেছে।

—মেয়ে? কিশোরীদার মেয়ে আছে? কী নাম?

—অনুরাধা সরকার, স্বামীর নাম তারক সরকার।

বলাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমার বুক টিপটিপ করছে। তাহলে অনুরাধার বাবা অনাথবন্ধু চক্রবর্তী নয়। কিশোরীমোহন ঘোষ। তাহলে মা কে? অনাথবন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কিশোরীদার অবৈধ ব্যাপার ছিল। আমরা উঠে পড়লুম। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে গুম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ।

বলাই বললে, তোর মতো ভাগ্য মাইরি দেখা যায় না। শুয়ে শুয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছিস।

—অনুরাধা কার মেয়ে?

—যারই হোক, এখন সে তোর বউ।

—কিশোরীদা আমায় আগে বলেনি কেন?

—খুব সহজ। ব্যাপারটা অনুরাধা যাতে জানতে না পারে।

—অনুরাধার মা চরিত্রহীন।

—চরিত্রের কী দাম আছে! সুখটাই তো জীবনের সব। একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেটে পেট ভরবে। তুই তারক সরকার, তোর বউয়ের নাম অনুরাধা সরকার, শ্বশুরের নাম কিশোরীমোহন ঘোষ। এর বেশি তোর জানার দরকারটা কী! কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক। এরপর আর পেছনের পাতা উল্টে লাভ কী।

—অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করব ?

—লাভ নেই। সে এর কিছুই জানে না।

—অনুরাধার মাকে ?

—সেটা একটা কত বড় অভদ্রতা ! রহস্যটা রহস্যই থাক না তারক ! সব কিছু জানতে গেলে মানুষের দুঃখ বাড়ে। যত কম জানবে তত সুখে থাকবে।

লোকে আমাকে গুছাইত বলে। আমি কিন্তু নিজে কিছুই গুছোইনি। আমার ভাগ্যই আমাকে গুছিয়ে দিয়েছে। লোকে বলে—তারক ? ও তো লোহা ধরলে সোনা হয়ে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়ালে, একটা লোকের ছবি ভেসে ওঠে— বেশ মোটা সোটা। মাথার সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখ দুটো ধূর্ত শৃগালের মতো। গলকম্বলটা স্ফীত। যেন ঢোঁক গিলে কিছু একটা ধরে রেখেছে সেখানে চিরজীবনের মতো। একটা প্রশ্ন—অনুরাধা ! তুমি কার মেয়ে ! কিশোরীদার এক প্রেমিকা ছিল, তার নাম উমা। অনুরাধা ! তুমি কি উমার মেয়ে ? উমা মারা যাওয়ার পর ছোট্ট মেয়েটাকে অনাথবন্ধুর স্ত্রীর কোলে তুলে দিয়েছিল ! অনুরাধা যাকে মা বলে, তাকে প্রশ্নটা করলেই হয়। তবু করিনি কোনওদিন। তারক সরকার জীবন-রহস্যের মধ্যে থাকতে ভালবাসে ব্যর্থ একজন গোয়েন্দার মতো। উত্তর চিরকালে লীন হয়ে গেছে। অনুরাধা যাঁকে মা বলত, তিনি মারা গেছেন। সমস্ত উত্তরের সমাধি। তা থাক এতে আমার সুখের কোনও কমতি হয়নি।

কিশোরীদার সেই গ্যারেজ এখন বিশাল হয়ে গেছে। বলাই এখন ফোরম্যান। একটা চোখ গচ্চা দিয়ে নিতাই এখন ভাল ছেলে। ইঞ্জিনের টিউনিং-এর কাজ খুব ভাল রপ্ত করেছে। ফকির অ্যাকসান করতে গিয়ে রিঅ্যাকসানে ঝাঁঝরা হয়ে মরেছে। পাশাপাশি আর একটা ব্যবসা আমি খাড়া করেছি—এ টু জেড সাপ্লাই এজেন্সি। মাছের তেলে মাছভাজা। এর মাল নিয়ে ওকে দেওয়া, ওর মাল নিয়ে একে দেওয়া, মাঝখানে বসে বোয়াল মাছের মতো প্রফিটটা খেয়ে নেওয়া। পুরনো লঝঝড় গাড়ি মেরামত করে ডবল দামে ঝেড়ে দেওয়া। দালাল দি গ্রেট ভানু বোস আমার অনেক গুরুর এক গুরু। ভানুদা বলেছিল—মানুষকে হিপনোটাইজ করে ফেলবি। চেহারায়, কথায়, চোখের চাহনিতে। এরই নাম ঐশী শক্তি। কাজ গুছোবার কায়দাই হল কথা। জলের মতো গলগল করে ঢুকবি, হলহল করে কথা বলবি। একেবারে আপনজন হয়ে যাবি। মাল ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবি। খদ্দের ধরা আর মাছ ধরা এক জিনিস। বেশ চার করে, টোপ মেরে খেলিয়ে তুলবি। জানবি,

বোকা বোকা, ভোঁতা ভোঁতা চেহারার অনেক অ্যাডভান্টেজ। বাইরে ভোঁদা ভালে, ভেতরে মিচকেপটাশ। এই হল সাফল্যের চাবিকাঠি।

বলাই শিল্পীদের মতো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল রেখেছে। দৈত্যের মতো চেহারা হয়েছে। হাত দুটো মুগুরের মতো। সকালে হাতুড়ি পেটে কাহাররা তালে, তবলা সাধে তিনতালে। তেহাই মারার সময় পেছনের চুল সামনে ঝাঁপায়, সামনের চুল পেছনে। অনুরাধাকে সেতার ধরিয়েছে। রাতে আমাদের ময়ূরমহল জমজমাট।

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ। যাই করি না কেন, একটা অনুসন্ধান তো ভেতরে রয়েছে। লোকে ঈশ্বরকে খোঁজে। আমি একটা মানুষকে খুঁজছি—কিশোরীদা। যেখানেই সন্ন্যাসীদের জমায়েত, সেইখানেই আমি আর বলাই। আখড়ায় আখড়ার বাইরে কিশোরীদাকে খুঁজি। এবারের প্রয়াগেও আমাদের একই কাজ। একদিন দুপুরে সন্ন্যাসীদের পঙ্গতে একজনকে মনে হল, অবিকল কিশোরীদা। গোঁফ, দাড়ি, জটা বাদ দিলেই কিশোরীদা। সন্ন্যাসীকে চোখে চোখে রেখে সুন্দর মুখে তার কুঠিয়ায় চড়াও হলুম। লম্বায়, চওড়ায় কিশোরীদার চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিল। সন্ন্যাসী আসনে বসেছিলেন। আমরা প্রণাম করলুম। তিনি মৃদু, মিষ্টি গলায় বললেন—

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—কলকাতা। মহারাজ ! আপনি আমাদের চিনতে পারছেন ?

—নিশ্চয় পারছি।

—কে বলুন তো ?

—তোমরা দুই ভক্ত। মুমুক্ষু। সাধুসঙ্গের বাসনা হয়েছে।

আমাদের আগে কোথাও দেখেছেন ?

—অবশ্যই। হৃদয় মন্দিরে।

না, এইভাবে পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। গলার স্বর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। খুব আস্তে কথা বলছেন। মুখে কোনও ভাবের পরিবর্তন নেই। চোখ স্থির। বাইরের লক্ষণ দেখে ধরার উপায় নেই। বলাই দুম্ করে প্রশ্ন করলে—আপনি কি আমাদের কিশোরীদা ?

সন্ন্যাসী বললেন—তোমাদের ভুল হয়েছে বাবা। আমার পূর্বাশ্রমের নাম কিশোরী নয়।

আমরা চলে এলুম। পরের দিন সেই কুঠিয়ায় গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই, এক মুঠো ছাই পড়ে আছে। সন্দেহটা বেড়ে গেল। নিশ্চয় কিশোরীদা,

তা না হলে চলে যাবেন কেন। গোটা মেলাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। কোথায় কিশোরীদার মতো দেখতে সেই সাধু! বেপাত্তা। বলাই বললে—পেয়েও পেলুম না। দু'হাতে জড়িয়ে ধরা উচিত ছিল।

সেই দিন বিকেলবেলা আমরা একটা দোকানে বসে চা, সামোসা খাচ্ছি, দেখি এক বৃদ্ধ বাঙালি দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন, ঢুকবো কি ঢুকবো না। বলাইয়ের ঝাল লেগেছে, আধচোখ বুজিয়ে উ হা করছে। হঠাৎ আমার মনে হল, লোকটিকে আমি চিনি। চায়ের ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে দোকানের বাইরে এসে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি বিশ্বনাথবাবু না? ভদ্রলোক ঘোলাটে, মৃত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠিক চিনতে পারছি না তো!

—না পারারই কথা। অনেক বছর আগে আপনার একটা সুখের সংসার ছিল।

—তা ছিল। আপনি জানলেন কি করে?

—জানি আমি। আপনার স্ত্রীর নাম ছিল চম্পা সরকার। আপনি রেলে চাকরি করতেন। আপনার একটা ছেলে ছিল। তার নাম তারক। আমি সেই তারক সরকার। কবে ছাড়া পেলেন আপনি!

বিশ্বনাথ সরকার পালাতে চাইছিলেন। বলাই এসে হাত ছেপে ধরেছে—আপনি পালাতে চাইছেন কেন?

বসুন। চা, সিঙ্গাড়া খাবেন বলুন। বৃদ্ধ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে! শেষে একটা বেঞ্চিতে বসলেন আড়ষ্ট হয়ে।

—কবে ছাড়া পেলেন?

—এই মাস তিনেক হল।

—এখানে কি ভাবে এলেন?

—যে-ভাবে সবাই আসে। আমি যাকে রেখেছিলুম সেই আমাকে এখন রেখেছে। একটা কথা কাছে—যাকে রাখো সেই রাখে।

—আপনার বাড়িতে আপনি ফিরে যেতে পারেন।

পাগল হয়েচো। ও তো পাপের বাড়ি। সব কটা ইট আমার পাপের সাক্ষী। ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও। আমার এক চোখে ছিল কামিনী, আর এক চোখে কাঞ্চন! দুটো চোখই আমার চলে গেছে তারক। আমি এখন জরদগব এক বৃদ্ধ। এই তীর্থে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলে যাই দুটো জিনিস—কামিনী আর কাঞ্চন। তোমার মায়ের মন ছিল আর ডালিমের ছিল

শরীর। দুটো এক জায়গায় মিলল না। তাই এই দুর্ভোগ। তোমার অনেক টাকা হয়েছে তারক। সাবধান।

—চলুন, আপনাকে আপনার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

—কোনও দরকার নেই। মনে করো তোমার বাবা বিশ্বনাথ সরকারের মৃত্যু হয়েছে।

—কোথায় উঠেছেন?

—পুরুল্মী রোড।

বিশ্বনাথ সরকার, রেলের মালবাবু, সন্ধ্যার অন্ধকারে জনসমুদ্রে মিশে গেলেন। গায়ে একটা খেরো আলোয়ান। এক মাথা পাকা চুল। আমি আর বলাই দাঁড়িয়ে দেখলুম, একটা মানুষ নয়, প্রয়াগের সোনালি অন্ধকারে, ত্রিবেণীর দিকে এগিয়ে চলেছে সময়ের পুলিন্দা, আটাত্তরটা বছরের একটা পুরিয়া। সব কিছু ছাপিয়ে কানে আসছে, বটতলার পাঁচালিকারের সেই ছড়া, মূল্য, ছ পয়সা।

> শোনো শোনো কী আশ্চর্য কলির কাহিনী।
> ঘরকা বহুরি প্রীত না পাওয়ে চিত চোরাওয়ে দাসী।
> ধন্য কলিযুগ তোমার তামাসা, দুখ্ লাগে আবার হাসি ॥